প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ১৭-১৮তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ চৈত্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ৩ রজব, ১৪৩৭ হিজরি | ৩১ আমান, ১৩৯৬ হি. শা. | ৩১ মার্চ, ২০১৭ ঈসাব্দ

বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের ৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০১৭ সফলতার সাথে সমাপ্ত

বিস্তারিত ৫০ পৃষ্ঠায়

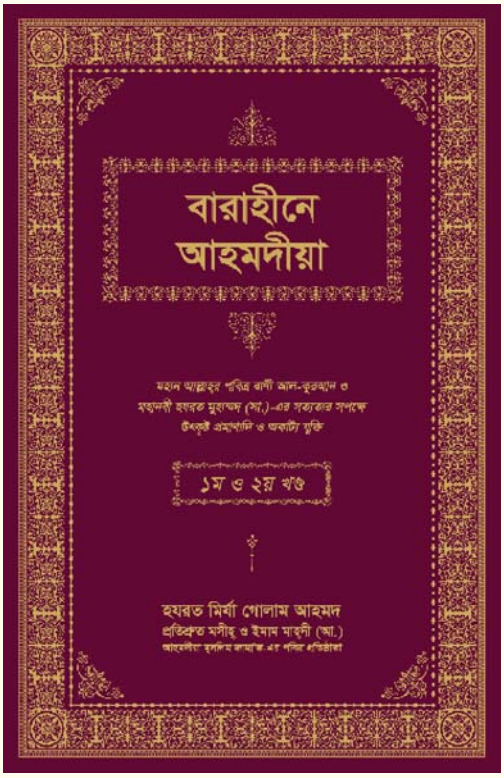

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

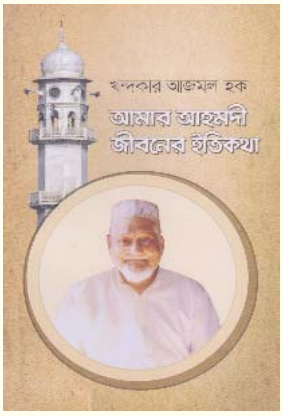

খন্দকার আজমল হক সাহেব জামা'তের একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। বহুকাল যাবত বিভিন্ন সেবা দ্বারা জামা'তের খেদমত করে চলেছেন। লিখেছেন **'কুরআন ও জীবন'** নামক একটি অনন্য পুস্তক। বলা যায়, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আহমদীর ঘরে এই বইটি রয়েছে যার মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ জামা'তের এই নিষ্ঠাবান সেবকের জীবনীমূলক বই **'আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা'** প্রকাশিত হয়েছে। জামা'তের নতুন সেবকদের জন্য এটি একটি প্রেরণামূলক পুস্তক।

পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। যার মূল্য ৫০/- টাকা মাত্র। জামা'তের সকলকে বইটি অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

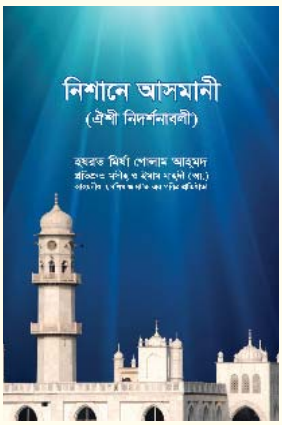

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্‌দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official
Commercial/Industrial
Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

আহমদীয়াতের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল দিন ২৩ মার্চ

মার্চ মাস, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে, তেমনি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে এ মাস এক অবিস্মরণীয় অবস্থান রাখে। ১৮৮৯ সনের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে ঐশী-প্রতিশ্রুতি মোতাবেক **'বাবে লুদ'** তথা লুধিয়ানা শহরে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আবির্ভূত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর হাতে ৪০ জন বয়'আত গ্রহণ করেন। এই ৪০ জনকে নিয়েই শুরু হয়েছিল আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা।

তিনি (আ.) বয়'আতে ইচ্ছুক সকলকে, এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আলোকপাত করে পূর্বেই ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ প্রচারিত এক ইশতেহারযোগে (প্রচারপত্র) জানিয়ে দেন–

"মুত্তাকীদের জামাত গঠন অর্থাৎ খোদা ভীরুতায় অলংকৃত ব্যক্তিদের এক জামা'তে সংঘবদ্ধ করা হলো বয়'আতের এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, যাতে খোদাভীরুদের এমন বড় এক দল গঠিত হয়ে জগতে নিজেদের পবিত্র প্রভাবের বিস্তার ঘটাতে পারে এবং তাদের একতা, ইসলামের জন্য কল্যাণ, মাহাত্ম্য ও শুভ পরিণাম বয়ে আনে। তারা এক ও অভিন্ন বিষয়ে সমবেত হওয়ার কল্যাণে, ইসলামের পূত-পবিত্র সেবায় দ্রুত কাজে আসতে পারে। তারা যেন অলস, কৃপণ ও অকর্মণ্য মুসলমান সাব্যস্ত না হয়। আর এমন অর্বাচীন লোকদের মতও যেন না হয়, যারা নিজেদের মতবিরোধ ও অনৈক্যের মাধ্যমে ইসলামের বিরাট ক্ষতি সাধন করেছে, এর (অর্থাৎ ইসলামের) অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় নিজেদের দুষ্কর্মপরায়ণতার কালিমা লেপন করেছে। আবার এমন উদাসীন দরবেশ ও ঘুরকুনোর মতও যেন না হয়, যারা ইসলামের বর্তমান চাহিদাগুলো সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না, যাদের নিজ ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের কোন মনমানসিকতা নেই আর যাদের মানব-সন্তানের কল্যাণ সাধনের কোন অনুপ্রেরণা বা স্পৃহাও নেই। পক্ষান্তরে এদের অর্থাৎ বয়'আতকারীদের জাতির প্রতি এমন সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত যারা হবে গরীবের আশ্রয়স্থল, এতীমদের জন্য পিতৃতুল্য ও ইসলামের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা ও সহায়তা দিতে হবে একান্তই অন্তরঙ্গ-প্রেমিকের মত আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত এবং যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধ্য-সাধনা এ উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত, যেন তাদের সার্বজনীন কল্যাণ পৃথিবীময় বিস্তার লাভ করে। ঐশীপ্রেমে ও খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার পবিত্র প্রস্রবণ ধারা যেন প্রতিটি হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে একস্থানে মিলিত হয়ে বহমান এক সমুদ্র স্রোতের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ...খোদা তা'লা এই দলকে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে ও স্বীয় শক্তি, ক্ষমতা ও মহিমা প্রদর্শনের জন্য সৃষ্টি করতে আর উন্নতি দিতে, এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে পৃথিবীতে খোদাপ্রেম, সত্যিকার অনুতাপ, পবিত্রতা, প্রকৃত ও সঠিক পুণ্যকর্ম, শান্তি ও কল্যাণ এবং মানবসন্তানদের পরস্পরের মাঝে মায়া-মমতা ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দিতে পারেন। অতএব এই দল, তাঁর বিশেষ এক দলের মর্যাদা পাবে। তিনি তাদেরকে তাঁর নিজস্ব বিশেষ প্রেরণায় শক্তি যোগাবেন। তাদেরকে কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি দেবেন। অতঃপর তাদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করবেন। তিনি যেমনটি তাঁর নিজ পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই দলকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি দান করবেন এবং হাজার হাজার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদীদের এতে প্রবিষ্ট করবেন। তিনি স্বয়ং এতে পানি সিঞ্চন করবেন এবং একে উন্নতি দান করবেন এতটা যে, এদের আধিক্য ও কল্যাণসমূহ মানবীয় দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক মনে হবে। তারা উঁচু স্থানে স্থাপিত প্রদীপ্ত মশালের মত দুনিয়ার চতুর্দিকে স্বীয় আলোকময় দ্যুতি ছড়িয়ে দেবে আর ইসলামের কল্যাণরাজির জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শরূপে স্বীকৃত হবেন। তিনি এই জামাতের পূর্ণ অনুসারীদেরকে সকল প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে অন্য জামাতের ওপর পূর্ণ বিজয় দান করবেন। কেয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ীভাবে তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে, যাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে। সেই মহা-প্রতাপান্বিত প্রতিপালক এটাই চেয়েছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, যা-ই চান, করে থাকেন। প্রত্যেক শক্তি ও মহিমা তাঁরই।" (তবলীগে রিসালত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫০ থেকে ১৫৫)

আজ সারা বিশ্বের ২০৯টি দেশে কোটি কোটি মানুষ তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ও ইমাম মাহদী হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনে তৎপর রয়েছে। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর গতিশীল নেতৃত্বে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দেশের সত্যান্বেষীদেরকেও সত্য মসীহ্-মাহদীকে চেনার এবং তাঁকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

২৬ মার্চ : সকলকে মহান স্বাধীনতা-দিবসের নিরন্তর শুভেচ্ছা

২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। জাতি এ বছর গৌরবদীপ্ত স্বাধীনতার ৪৬তম বার্ষিকী পালন করছে। স্বাধীনতা যে কোনো জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন। রক্ত দিয়ে কেনা স্বাধীনতার প্রাসঙ্গিকতা যে আরও বেশি তা সহজেই অনুমেয়। পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয় স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মপ্রকাশের ঘটনাকে। স্বাধীনতার জন্য এ দেশের ৩০ লাখ মানুষ আত্মোৎসর্গ করেছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক জান্তা রাতের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত মানুষের ওপর। শুরু হয় ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরতম গণহত্যা। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে ২৬ মার্চের শুরুতেই বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ডাক দেন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অর্জিত হয় মুক্তিযুদ্ধের মহিমান্বিত বিজয়। মহান স্বাধীনতার এই দিনে আমরা স্মরণ করছি তাদের, যারা আত্মদান করে আমাদের দিয়েছেন স্বাধীন-স্বদেশ। এখন এ দেশকে বিশ্বের মানচিত্রে উন্নত এক দেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে আমাদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব ভূমিকা পালনে সদা তৎপর থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

সূচিপত্রে

১৫ ও ৩১ মার্চ, ২০১৭

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)- এর ২০ মার্চ, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৮

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ১৮

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ২৯
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

২৩ মার্চ: প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর বয়আত দিবস ৩১
মৌলবী এনামুল হক রনী

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা ৩৫
মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

কলমের জিহাদ ৩৭
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

শরীয়ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী ৩৯
খন্দকার আজমল হক

ক্বারী নঈমুদ্দিন স্মরণে (আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের পিতা) ৪৫
খন্দকার মাহবুব-উল-ইসলাম

নান্দনিক শিক্ষাসফর কক্সবাজার ৪৬

সংবাদ ৪৭

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন ৫২

পাক্ষিক **‘আহমদী’** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **‘আহমদী’**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **‘আহমদী’** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٥﴾

৯৫। আর পরস্পরকে প্রতারণা করার জন্য তোমরা নিজেদের কসমকে মাধ্যম বানিও না। নতুবা তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ়[১৫৭৪] হবার পর তোমাদের পদস্খলন ঘটবে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দেয়ার দরুন তোমরা মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হবে। আর তোমাদের ওপর এক বড় আযাব (অবতীর্ণ) হবে।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। আর তোমরা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার নগণ্য মূল্যে[১৫৭৫] বিক্রি করো না। তোমরা যদি জ্ঞান রাখতে (তাহলে বুঝতে পারতে) আল্লাহ্‌র কাছে যা-ই রয়েছে তা নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۭ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭। তোমাদের কাছে যা আছে তা ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা (চির) স্থায়ী হবে। আর যারা ধৈর্য ধরেছে আমরা অবশ্যই তাদের সবচেয়ে উত্তম কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দিব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮। পুরুষ বা নারীর[১৫৭৬] মাঝে যে-ই মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করবে আমরা নিশ্চয় তাকে এক পবিত্র জীবন দান করবো। আর আমরা তাদের সবচেয়ে উত্তম কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দিব।

১৫৭৪। তোমাদের এইরূপ আচরণ তোমাদেরকে দুর্বল করবে।

১৫৭৫। যখন কোন জাতি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায় তখন তারা সাধারণত সকল প্রকার প্রলোভনের শিকার হয়। তাদের শত্রুরা তখন তাদেরই মধ্য থেকে গুপ্তচর নিয়োগ করে এবং মোটা অঙ্কের ঘুষের প্রলোভন দ্বারা রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস করতে চায়। এহেন অবস্থার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "লা তাশতারু বিআহদিল্লাহি সামানান ক্বালীলান" অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না।

১৫৭৬। এই আয়াতে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং উভয়ের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতের সমান অংশের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

হাদীস শরীফ

প্রতারণা গর্হিত এক অপরাধ

হাদীসঃ "আন আবি হুরায়রাতা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা মান গাশ্‌শা ফালায়সা মিন্না" (মুসলিম)।

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্ তা'লা মানবকে বহুগুণে ভূষিত করেছেন। এ সকল গুণাবলীর মধ্য হতে কিছু এমন মৌলিক গুণ রয়েছে যা না থাকলে মানুষ, মানুষ থাকতে পারে না। এই মৌলিক গুণাবলীর অন্যতম হলো সততা। সততা হাত ছাড়া হলে মানুষ বিভিন্ন ধরণের প্রতারণার শিকার হয়ে যায়। কারণ সততা না থাকলে শূন্য স্থানটি প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ হয় না।

পবিত্র কুরআন মানবীয় এই দুর্বলতার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। কুরআন বলে, মানুষ যখনই সত্যকে গ্রহণ করে না এবং সততাকে বিসর্জন দেয় তখন সে বিভিন্ন অপ-কৌশল অবলম্বন করে এবং এমন আচরণ করে যেন সে সততার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এভাবে সে মানুষকে ধোঁকা দিতে চায়। খোদা তা'লা বলেন, এরা কাকে কী ধোঁকা দিবে! আসলে তো এরা নিজেরাই নিজ আত্মার বিরুদ্ধে প্রতারণা করছে, যার পরিণামে বেদনাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসটি হযরত রসূলে করীম (সা.) তাঁর (সা.) সাথে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন। একদা হুযূর (সা.) এক শস্য বিক্রেতার কাছে গেলেন। তিনি (সা.) শস্যের ভিতর হাত দিয়ে দেখলেন তা ভিজা অথচ উপরের শস্য শুকনো। এটি দেখে হুযূর (সা.)-এর চেহারা লাল বর্ণের হয়ে গেল। তিনি (সা.) রাগান্বিত স্বরে বললেন, ইসলামে প্রতারণা নিষিদ্ধ। যে মুসলমান ধোঁকাবাজী করে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি (সা.) আরো বললেন, তোমার বিক্রিযোগ্য জিনিসে কোন ধরণের ত্রুটি থাকলে তা বলে দাও। এবং ঐ ত্রুটি অনুসারে দাম নির্ধারিত করে বিক্রি করো। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর উপরোক্ত নির্দেশের ফলে সাহাবাদের মাঝে এমন পরিবর্তন আসলো যে, সাহাবীগণ যদি কোন কিছু বিক্রি করতেন তাহলে দাম কম রাখতেন। অথচ ক্রেতা সাহাবীগণ অনুরোধ করতেন, এটির দাম এত কম নয় আরো বাড়িয়ে নাও। আজকের যুগে এটি আমাদের নিকট অসম্ভব বলে মনে হবে। কিন্তু ইসলামের মূল শিক্ষা এটিই।

আজ সারা বিশ্বের ব্যবসা প্রতারণার দ্বারাই চলছে। কোন না কোন স্তরে গিয়ে প্রতারণা হচ্ছে, যার কারণে আজ পৃথিবী অশান্ত, মানুষ অশান্ত। আজও আমাদের জীবন একমাত্র সততা দ্বারাই শান্তিময় হতে পারে। চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাবো যে, আজ আমরা প্রতারণার জালে আবদ্ধ রয়েছি, যা হতে মুক্ত না হলে ইহকালও নষ্ট হবে, নষ্ট হবে পরকালও। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করার তৌফিক দিন এবং হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সাহচর্য লাভ করার তৌফিক দিন, আমীন!

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : **আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলা

অমৃতবাণী

নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে বরং তা ফুঁসে উঠে উত্তাল রূপ ধারণ করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে তারা গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ ধর্মের প্রতি করুণা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে জাগতিক ধন-সম্পদের বিনিময়ে কি পরিত্যাগ করা হচ্ছে না?

আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য-নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রীস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখি নি। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। তারা দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে আর 'তাকওয়া ও খোদাভীতি'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বরং তারা এ রীতির বিরোধীতা করে হীন-পতিত বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে। আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে এর খুব কমই বর্ণনা করেছি।

আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় আস্ফালন রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্যপশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্‌র নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রীস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে।

এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এদের মতভেদ দূর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মুমিনদের জন্য আগত সেই **'ইমাম'** আর আমিই খ্রীস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই **'মসীহ্'**।

(সিররুল খিলাফা পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩৪তম কিস্তি)

মানুষের উপস্থাপিত বিভিন্ন রকম প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ঃ হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের মৃত্যুবরণ কুরআন করীম থেকে কোথায় প্রমাণিত হয়? বরং **'রাফিউকা ইলাইয়া'** এবং **'বাল্‌রাফায়াল্লাহু ইলাইহি'** আয়াতদ্বয়ের বাক্য দুটি প্রমাণ করে যে, মসীহ্ দেহসহ আকাশের দিকে উত্থিত হয়েছিলেন। অনুরূপ, **"ওয়ামা ক্বাতালূহু ওয়া মা সালাবূহু ওয়ালাকিন শুব্বিহা-লাহুম"** আয়াতটিও এটাই প্রমাণ করে যে মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হন নি এবং নিহতও হন নি।

উত্তর ঃ অতএব জানা আবশ্যক, খোদা তা'লার দিকে কারও উত্থিত হওয়ার অর্থই হলো যে সে-ব্যক্তি মারা গেছেন। যেমন খোদা তা'লা বলেন ঃ **'ইরজিয়ী ইলা রাব্বিক'** [অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্‌তে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাও' (সূরা আল্ ফাজ্‌র ঃ ২৯) অনুবাদক] আরও যেমন তিনি বলেন, **'ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওফ্‌ফিকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া'** [হে ঈসা নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দেব এবং আমার দিকে তোমাকে উঠাবো, (আলে ইমরান ঃ ৫৬) –অনুবাদক]। উক্ত বাক্যদ্বয়ের একই অর্থ [বিধায় এটাই সাব্যস্ত হয় যে, ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন]। তাছাড়া কুরআন করীমে হযরত মসীহ্‌র মারা যাওয়ার সম্পর্কে যেসব বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল বর্ণনাসমূহ রয়েছে এর চেয়ে বেশী কল্পনা করা যায় না। কেননা খোদা তা'লা সাধারণ ও অসাধারণ উভয় সম্ভাব্য ধারায় ঈসা (আ.)-এর মারা যাওয়ার বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন, সাধারণ প্রাকৃতিক ধারায় তাঁর মৃত্যুবরণ সম্পর্কে বলেন, **"ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন ক্বদ খালাত্ মিন ক্বাবলিহির রুসুলা আফা ইম্মাতা আও ক্বুতিলান্‌ক্বালাবতুম আলা আ'ক্বাবিকুম"** (আলে ইমরান ঃ ১৪৫)। অর্থাৎ, 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কেবল একজন রসূল। তার পূর্বের সকল রসূল গত হয়েছে, তথা ইন্তেকাল করেছে। এখন এই রসূল (মুহাম্মদ সা.) মারা গেলে অথবা নিহত হলে তোমরা কি দ্বীন-ইসলাম পরিত্যাগ করবে?' এখন লক্ষ্য করুন, যৌক্তিক ধারায় উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সংবলিত এ আয়াতটি স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, সকল রসূলই মৃত্যুর সম্মুখীন তথা শিকার হয়েছেন যদিও সে-মৃত্যু প্রাকৃতিক ধারায় হোক অথবা হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে সংঘটিত হোক। তাই বিগত নবীদের মধ্যকার এমন একজন নবীও নেই যিনি মৃত্যুবরণ থেকে বেঁচে গেছেন। অতএব, এস্থলে দর্শকবৃন্দ স্বতঃস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারছেন যে, হযরত মসীহ্ বিগত নবী-রসূলগণের মধ্যকার একজন হওয়া সত্ত্বেও যদি এখনও মারা যান নি, বরং জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হয়ে থাকেন, তাহলে এমতাবস্থায় সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে বিগত সকল নবীর মৃত্যবরণের প্রমাণ উপস্থাপন করে এমন আয়াতের বিষয়বস্তু সঠিক বলে সাব্যস্ত হতে পারে না, বরং এর এই যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনই বৃথা এবং জেরাগ্রস্ত হবে।

সাধারণভাবে যুক্তি উপস্থাপনের ধারায় যে দ্বিতীয় আয়াতটি হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করে সে আয়াতটি হলো ঃ **"ওয়ামা জায়ালনা হুম জাসাদান লা ইয়া'কুলুনা ত্‌তোয়ামা ওয়া মা কানু খালেদীন"** (সূরাহ্ আল্ আম্বিয়া ঃ ৯)। অর্থাৎ 'আমরা তাদের এমন দেহ বিশিষ্ট করে বানাই নি যারা খাবার খেতো না (তথা খাওয়ার মুখাপেক্ষী ছিল না। তারা সবাই মারা গেছেন। তাদের মধ্যকার কেউ অবশিষ্ট (তথা চিরস্থায়ীভাবে বেঁচে) নেই।

আর সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের ধারায় আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন ঃ **"ওয়া মা জাআলনা লি-বাশারিম্ মিন ক্বাবলিকাল্ খুল্‌দ আফা ইম্মিত্‌তা ফাহুমুল খালিদূন কুল্লু নাফ্‌সিন যায়িক্বাতুল মাউত।"** [(আল্ আম্বিয়া ঃ ৩৫-৩৬) অর্থাৎ 'আর আমরা

তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী (জীবন দান) করিনি। অতএব তুমি মারা গেলে তারা কি চিরকাল (বেঁচে) থাকবে? প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"–অনুবাদক]।

সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে হযরত মসীহ্‌র মৃত্যুবরণ প্রমাণ করে এমন তৃতীয় আয়াতটি হলো ঃ **"ওয়া মিনকুম মাইঁ ইয়াতাওয়াফ্‌ফা ওয়া মিনকুম মাইঁ ইউরাদ্দু ইলা আরযালিল্ উমুরি লি-কাইলা ইয়া'লামা বা'দা ইল্‌মিন শাইয়ান"** (আল্ হাজ্জ ঃ ৬)। অর্থাৎ, 'হে মানব-সন্তান! তোমরা দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যারা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগেই মারা যায় অর্থাৎ তারা একেবারে যয়ীফ হয়ে মারা যায় না, বরং তার আগেই মারা যায়। দুই, সেই শ্রেণীর লোক যারা এতো বেশি বৃদ্ধ হয়ে যায় যে অতি দুর্বল ও ঘৃণাব্যঞ্জক অবস্থা ধারণ করে। এমন কি, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানে পরিণত হওয়ার পর একেবারে অবুঝ শিশুর মতো হয়ে যায় এবং আজীবন আহরিত ও সঞ্চিত জ্ঞানবুদ্ধি সবকিছুই অকস্মাৎ লোপ পায়।' খোদা তা'লা যেহেতু মানবজাতির স্বাভাবিক জীবন ও আয়ুষ্কালের ক্ষেত্রে তাদেরকে কেবল দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, সেহেতু আবশ্যকীয়ভাবে হযরত মসীহ্-ইবনে মরিয়ম সকল মাটির তৈরী বান্দাদের মতো উল্লিখিত বন্টনের বাইরে থাকতে পারেন না। এটা কোন দার্শনিকের তৈরি নিয়ম-কানুন নয় যা কেউ নস্যাৎ বা নাকস করে দিবে, বরং এটি তো 'সুন্নাতুল্লাহ্' তথা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সেই প্রকৃতিক নিয়ম-কানুন যা স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র বাণী কুরআন করীমেও সুস্পষ্টত বর্ণনা করেছেন।

অতএব মানুষের জীবনধারায় উল্লিখিত ঐশীবন্টন অনুসারে আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়, হযরত মসীহ্ (আ.) হয়তো **'মিনকুম মাইঁ ইয়াতাওয়াফ্‌ফা'** তথা ওফাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবেন এবং মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী বেহেশ্‌তে সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন যার সম্পর্কে তিনি নিজেই ইঞ্জিলে বর্ণনা করেছেন। নয়তো তিনি যদি এতো দীর্ঘকাল পর্যন্ত মারা না গিয়ে থাকেন তাহলে এর ফলে স্বাভাবিক বিবর্তনের প্রভাবে সেই চরম বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন যেখানে কর্মহীনতার দরুন তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের বহাল থাকা বা না থাকা সমান হয়ে দাঁড়ায়। আরও যেসব আয়াত হযরত মসীহ্‌র মৃত্যুবরণের অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরেছে সেগুলো বার বার বর্ণনা করা আমার পক্ষে জরুরী নয়।

এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, হযরত মসীহ্ **'রাফা'**-প্রাপ্তদের দলভুক্ত না হয়ে থাকলে– যারা চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে উন্নীত (বা তাঁর সান্নিধ্যে উপনীত) হয়েছেন। তিনি মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত কখনও তাদের সাথে শামিল হতে পারেন না যারা পরলোকে পাড়ি জমিয়েছেন। আর তিনি তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন বলে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেন। কেননা মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীস থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত যে হযরত মসীহ্ ওই পরলোকগত নবীগণের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন এবং ইয়াহ্‌ইয়া নবীর পাশে তিনি অবস্থান লাভ করেছেন। এমতাবস্থায় **'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া'** –আয়াতের অর্থ এমনটি সাব্যস্ত হবে ঃ **'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা ও রাফিউকা ইলা ইবাদিয়াল মুতাওয়াফ্‌ফিনাল মুক্বাররাবীন ওয়া মুল্‌হিকুকা বিস্‌সালেহীন'** (অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তোমাকে ওফাৎ তথা মৃত্যু দেব এবং আমার সেই বান্দাদের দিকে 'রাফা' দান করবো তথা উন্নীত করবো যারা আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং তোমাকে সালেহীনের সাথে মিলিত করবো –অনুবাদক)। অতএব স্বভাবতই জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য প্রকৃত সত্য অনুধাবনে এটুকুই যথেষ্ট যে হযরত মসীহ্‌কে জীবিতাবস্থায় সশরীরে ওঠানো হয়ে থাকলে তিনি আবার মৃতদের মাঝে কেনই বা ঢুকবেন?। (চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাড়ীঘর ও চেম্বারের সার্বক্ষণিক কাজের জন্য একজন কর্মী আবশ্যক।

যোগ্যতা :

১। নিয়মিত নামাযী ও চাঁদাদাতা (কমপক্ষে তিন বছর পূর্ব থেকে)।
২। ওয়াকারে আমলের কাজে অভিজ্ঞ ও সবধরণের পরিশ্রমে নিষ্ঠাবান।
৩। ডিকশনারীতে অক্ষর খুঁজতে অভিজ্ঞ ও লেনদেনে বিশ্বস্ত।

শর্তাবলী :

ক) ১১ মাস প্রশিক্ষণরত হিসেবে কাজের পর মাসিক ৬০০০/- টাকা সম্মানি হবে। দৈনিক ২০০/- টাকা হিসাবে ৩০ দিনের কাজের বিনিময়ে উক্ত সম্মানি প্রযোজ্য। সারা মাসে ৩০ দিনের কম কাজ করলে আনুপাতিক হারে সম্মানি কম হবে।
খ) প্রথম ১ মাস ৩৫% এবং পরবর্তী ১০ মাস ৭০% হারে সম্মানি দেওয়া হবে (দৈনিক ১৪০/- টাকা)।
গ) কমপক্ষে ৩ মাস নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে চাকুরি করার ওয়াদাবদ্ধ হতে হবে।

কায়েদ ও প্রেসিডেন্ট সাহেবের সত্যায়নসহ সাদা কাগজে আবেদন ও ওয়াদা করতে হবে।

এ সংক্রান্ত বর্তমান ও পরবর্তী সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
মোহাম্মদীয়া হোমিও চেম্বার
৩৭৫/৫ /এ, উত্তর পীরেরবাগ, মিরপুর-১
মোবাইল : ০১৭২১৭৩৭৯২৫, ০১৯১৩০৪৯৪১৩।

জুমুআর খুতবা

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার অন্যতম নিদর্শন
চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ

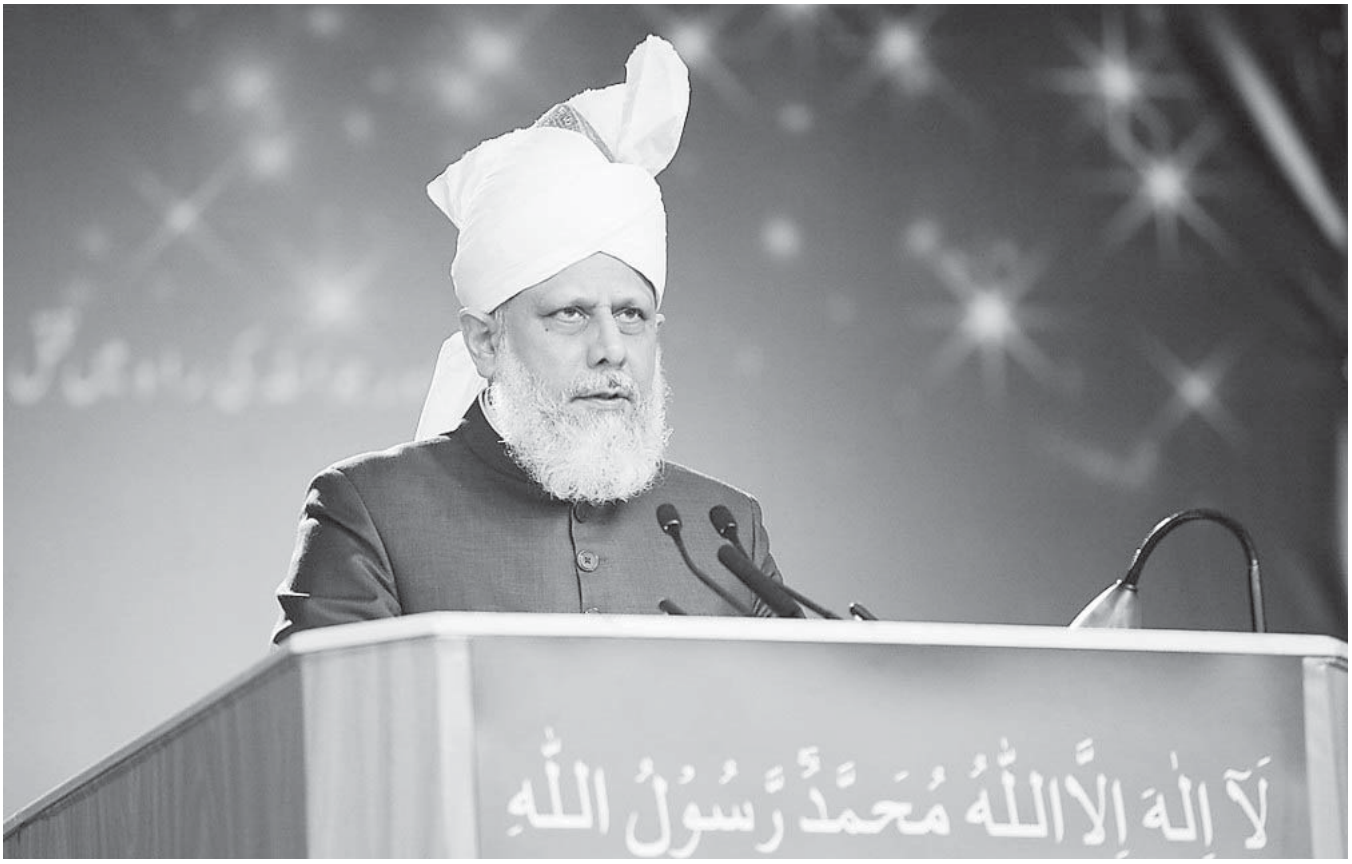

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)- এর ২০ মার্চ, ২০১৫ জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ সূর্য গ্রহণ হয়েছে, যা এখানে এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও দেখা গিয়েছে। এরূপ গ্রহণ কালে রসূলে করীম (সা.) বিশেষ ভাবে দোয়া, ইস্তেগফার ও সদকা-খয়রাত করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল কুসুফ, হাদীস নম্বর ১০৪৪, সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল কুসুফে ওয়া সালাতিহি, হাদীস নম্বর: ২১১৭)

সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ একটি নিদর্শন

এ দৃষ্টিকোণ থেকে সে সব জামা'তকে নামাযে কসূফ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যেসব স্থানে গ্রহণটি দেখা যাওয়ার সংবাদ ছিল। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে আমরাও এখানে নামাযে কসূফ পড়েছি। হাদীস শরীফে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকে খোদা তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি বিশেষ নিদর্শন আখ্যা দেয়া হয়েছে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল কুসুফ, হাদীস নম্বর ১০৫৩)

আজ সূর্য গ্রহণ হয়েছে, যা এখানে এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও দেখা গিয়েছে। এরূপ গ্রহণ কালে রসূলে করীম (সা.) বিশেষ ভাবে দোয়া, ইস্তেগফার ও সদকা-খয়রাত করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের নিদর্শনাবলীর মাঝে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ একটি অসাধারণ নিদর্শন ছিল, যা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় অংশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্রকাশ পেয়েছে। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণের নিদর্শনের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামা'তের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

আজকের এই গ্রহণকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়ার নিদর্শন বলা যাবে না, কিন্তু সাধারণ নিয়ম অনুসারে যেভাবে গ্রহণ হয়, সে অর্থেই এটি আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি। এটিকে সুনির্দিষ্ট গ্রহণ আখ্যায়িত করা যেতে পারে না ঠিকই, কিন্তু এ গ্রহণ অবশ্যই সেই গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। আজকের এ গ্রহণটি সেই নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের আরেকটি কারণ হল, আজ জুমুআর দিন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথেও জুমুআর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মার্চ মাস হওয়ার সুবাদেও এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কেননা, আর তিন দিন পর এ মাসেই অর্থাৎ, ২৩ মার্চ তারিখে মসীহ্ মওউদ দিবসও রয়েছে। তিনি দাবিও করেছেন এ দিনে। এক কথায় এই মাস, এই দিন এবং এই গ্রহণ, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত স্মৃতিপটে জাগ্রত করে। তাই নামাযে কসূফ-এর খুতবার জন্য আমি যখন রেফারেন্সেস বা উদ্ধৃতিসমূহ একত্রিত করি, তখন হৃদয় মাঝে এ ভাবনার উদয় হয় যে, জুমুআর খুতবাও এ গ্রহণের প্রেক্ষাপটে প্রদান করা উচিত। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী [যা ছিল, মহানবী (সা.)-এর করা ভবিষ্যদ্বাণী] সম্পর্কে তাঁর (আ.) কিছু অথবা দুই-একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। একইভাবে, এমন কয়েকজন সাহাবীর ঘটনা উপস্থাপনের কথাও ভেবেছি, যাঁরা এই নিদর্শন দেখে জামা'তভুক্ত হয়েছেন এবং নিজেদের ঈমানকে শানিত ও দীপ্তিমান করেছেন।

যেভাবে আমি বলেছি, মহানবী (সা.) যেহেতু এই গ্রহণগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, এ কারণেই তাঁর জীবদ্দশায় একবার যখন গ্রহণ লাগে, সেই প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। সেগুলোর একটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

হযরত আসমা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, সূর্য গ্রহণ যখন আরম্ভ হয়, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে আসি। আমি দেখলাম, তিনি নামায পড়ছেন। আমি বললাম, কী হয়েছে যে, এই অসময়ে মানুষ দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে? হযরত আয়েশা (রা.) আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেন এবং 'সুবহানাল্লাহ্' বলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি কোন নিদর্শন? তিনি মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে 'হ্যাঁ' বললেন। হযরত আসমা (রা.) বলেন, আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম আর এক পর্যায়ে আমার চেতনাহারা হবার উপক্রম হল। [অর্থাৎ মহানবী (সা.) দীর্ঘক্ষণ ধরে নামায পড়িয়েছেন,] তিনি বলেন, আমার বেহুশ হওয়ার উপক্রম হয়। আমি আমার মাথায় পানি ঢালা আরম্ভ করি। মহানবী (সা.) নামায শেষ করে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর, তিনি (সা.) বলেন, ইতিপূর্বে আমি যা কিছু দেখিনি, আজকে এখানে দাঁড়িয়ে সেই সবকিছু দেখতে পেয়েছি, এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামের আগুনও দেখেছি। আর আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, কবরে দাজ্জালের ফিতনা বা অনুরূপ ফিতনার মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। এরপর আরও বলেন, তোমাদের এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রশ্ন করা হবে, এই ব্যক্তি [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)] সম্পর্কে তুমি কী জান? তখন 'মু'মিন' বা 'যে বিশ্বাস পোষণ করে এমন ব্যক্তি' [হযরত আসমা (রা.) বলেন, এই দু'টি (শব্দে)র কোন একটি ব্যবহৃত হয়েছে।] বলবে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি আমাদের কাছে নিদর্শনাবলী এবং হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি এবং ঈমান এনেছি আর তাঁর অনুসরণ করেছি। তাকে বলা হবে তুমি সুখনিদ্রা যাপন কর। আমরা জানি, তুমি অবশ্যই ঈমানদার ছিলে।

আর মুনাফিক বা সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বলবে, আমি জানি না, ইনি কে! আমি লোকদেরকে তার সম্পর্কে একটি কথা বলতে শুনেছি আর আমিও তাদের কথায় সায় দিয়েছি। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল কুসুফ, হাদীস নম্বর ১০৫৩)

একইভাবে তিনি (সা.) একথাও বলেন যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি। কারো জীবন-মৃত্যুর সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই, তবে এই সময় দোয়া এবং ইস্তেগফার করা উচিত। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল কুসুফে ওয়া সালাতিহি, হাদীস নম্বর ২১১৭)

এখন আমি চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে উপর্যুপরি নিদর্শন প্রদর্শন

তিনি (আ.) বলেন, "আমি অবাক বিস্ময়ে দেখি, নিদর্শনের পর নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে, তবুও সত্য গ্রহণের প্রতি মৌলভীদের কোন মনোযোগ নেই। তারা এ-ও দেখে না যে, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পরাজিত করছেন। আর তারা মনে-প্রাণে চায়, কোন ঐশী সাহায্য ও সমর্থন যেন তাদের পক্ষে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমর্থনের পরিবর্তে প্রতিনিয়তই তাদের লাঞ্ছনা এবং ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। (অর্থাৎ, তাদের দুর্ভাগ্য ও বিফলতা সাব্যস্ত হয়)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে দিনগুলোতে জ্যোতির্বিদদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে যে, এ রমযানে চন্দ্র-সূর্য উভয়টিতে গ্রহণ লাগবে আর মানুষের হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয়েছে যে, এটি প্রতিশ্রুত ইমামের আবির্ভাবের নিদর্শন, তখন মৌলভীদের হৃদয় এ কারণে ধড়ফড় করে উঠে যে, শুধু এই ব্যক্তিই ধর্ম জগতে মাহদী এবং মসীহ্ হওয়ার দাবিদার। মানুষ না আবার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই, এ নিদর্শনটি আড়াল করার জন্য তখন অনেকেই প্রথমতঃ এ কথা বলা আরম্ভ করে যে, এ রমযানে আদৌ চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হবে না, বরং তখন গ্রহণ লাগবে, যখন তাদের ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন। কিন্তু রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয়ে গেলে তারা এই অজুহাত দেখায় যে, এই চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হাদীসে বর্ণিত তারিখ অনুসারে হয় নি। কেননা, হাদীসের শব্দ হল, চাঁদে গ্রহণ লাগবে প্রথম রাতে আর সূর্য গ্রহণ হবে মধ্যবর্তী তারিখে।" হুযূর (আ.) বলেন,"অথচ এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে চাঁদে গ্রহণ লেগেছে ত্রয়োদশতম (অর্থাৎ, ১৩ তারিখ) রাতে আর সূর্য গ্রহণ হয়েছে অষ্টাবিংশতম (অর্থাৎ, ২৮ তারিখ) দিনে। তাদেরকে যখন বুঝানো হল, হাদীসে মাসের প্রথম তারিখ বুঝানো হয়নি।

কেননা, প্রথম তারিখের চাঁদকে 'ক্বমর' বলা যায় না, এর নাম হল,'হেলাল'। আর হাদীসে হেলাল নয়, বরং 'ক্বমর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হাদীসের অর্থ হল, চাঁদে গ্রহণ লাগবে গ্রহণের নির্ধারিত রাতগুলোর প্রথম রাতে অর্থাৎ, মাসের ত্রয়োদশতম রাতে আর সূর্যে গ্রহণ লাগবে মধ্যবর্তী দিনে অর্থাৎ, আটাশ তারিখে, যা গ্রহণের নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিন। তখন নির্বোধ মৌলভীরা এই সঠিক অর্থ শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হয় আর খুবই কষ্টেসৃষ্টে দ্বিতীয় এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, এই হাদীসের 'রিজাল'-এ এক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য নন (অর্থাৎ, বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতার মাঝে এক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য নন)। তখন তাদেরকে বলা হল, যেহেতু হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে অতএব, হাদীসের শুদ্ধতার নিরিখে সংঘটিত অকাট্য প্রমাণ বহনকারী ঘটনার বিপরীতে সন্দেহের উপর ভিত্তি করে বিতর্ক উঠানো কোনই গুরুত্ব রাখে না। অর্থাৎ, ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটি সত্যবাদীর উক্তি। আর এখন এ কথা বলা যে, তিনি সত্যবাদী নন বরং মিথ্যাবাদী, এটি সুস্পষ্ট সত্যকে অস্বীকারেরই নামান্তর। আর আদিকাল থেকে মুহাদ্দিসদের এই রীতিই চলে আসছে যে, সন্দেহ কখনোই নিশ্চিত বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। ভবিষ্যদ্বাণীর বার্তা অনুসারে মাহ্দীর দাবিদার এক ব্যক্তির জীবনে এর পূর্ণ হওয়া, এ কথারই নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করে যে, যার মুখ থেকে সেই শব্দ নিঃসৃত হয়েছে, তিনি সত্য বলেছেন।

কিন্তু এই কথা বলা যে, তার চাল-চলনে আমাদের সন্দেহ আছে, (অর্থাৎ, দাবিকারীর) এটি একটি সন্দেহযুক্ত বিষয়। আর মিথ্যুকও কখনো সত্য বলে থাকে (অর্থাৎ, মিথ্যাবাদীও সত্য কথা বলতে পারে)। এছাড়া এই ভবিষ্যদ্বাণী অন্যভাবেও সত্য প্রমাণিত হয় এবং হানাফীদের কোন কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও এটি লিখেছেন। তাই, এটি অস্বীকার করা ইনসাফের দাবি পরিপন্থী কাজ, বরং নিছক হঠকারীতা। এই দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেয়ার পর তারা বলতে বাধ্য হয় যে, হাদীসটি সঠিক আর এ থেকে এটিই বুঝা যায়, অচিরেই ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন,তবে এই ব্যক্তি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী নন [অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)]। বরং তিনি ভিন্ন এক ব্যক্তি হবেন, যিনি অচিরেই আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তাদের এই উত্তরও অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, অন্য কোন ইমাম থাকলে হাদীসের ভাষ্যমতে সেই ইমামের উচিত ছিল,শতাব্দীর শিরোভাগে আসা।

কিন্তু চলতি শতাব্দীরও পনেরো বছর পার হয়ে গেছে অথচ তাদের কোন ইমাম আবির্ভূত হয়নি। এখন তাদের পক্ষ থেকে শেষ উত্তর হল, এরা কাফির। তাদের বই-পুস্তক পড়বে না। এদের সাথে মেলা-মেশা করবে না, এদের কথা শুনবে না। কেননা, তাদের কথা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এটি কত বড় শিক্ষনীয় বিষয় যে, আকাশও এদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাও এদের বিরোধী হয়ে গেছে। এটি তাদের কত বড় লাঞ্ছনা-গঞ্জনা যে, একদিকে আকাশ

মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের নিদর্শনাবলীর মাঝে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ একটি অসাধারণ নিদর্শন ছিল, যা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় অংশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্রকাশ পেয়েছে। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণের নিদর্শনের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামা'তের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে আর অপরদিকে পৃথিবীও ক্রুশীয় প্রাধান্যের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করছে। (জরুরতুল ইমাম, রুহানী খাযায়েন, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৫০৭-৫০৯)

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, "আমার সত্যতায় চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং শত শত মানুষ তা দেখে আমাদের জামা'তভুক্ত হয়েছে। আর এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণে আমরা প্রীত হয়েছি আর আমাদের বিরোধীরা হয়েছে লাঞ্ছিত। আমরা যখন প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবি করেছি, তখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হোক আর আরব দেশে এর কোন চিহ্নও না থাক –তারা কি কসম খেয়ে বলতে পারে যে, তাদের হৃদয় এটি পছন্দ করত? তাদের ইচ্ছা-বিরোধী এই নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের হৃদয় অবশ্যই দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে এবং নিজেদের লাঞ্ছনাই দেখে থাকবে।" (আনোয়ারুল ইসলাম, রুহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৩)

এরপর, এখন আমি কয়েকজন সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করছি -

হযরত গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "এই অধমের গ্রামে প্রথম দিকে মৌলভী বদরুদ্দীন সাহেব নামের এক ভদ্রলোক ছিলেন। সে সময় এই অধমের বয়স প্রায় পনের বছর ছিল। এই অধম মৌলভী বদরুদ্দীন সাহেবের সাথে তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখনই দিনের বেলায় সূর্যে গ্রহণ লাগে। মৌলভী সাহেব বলেন, সুবহানাল্লাহ্, মাহদী সাহেবের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর আগমনের সময় এসে গেছে। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মৌলভী সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান, পুণ্যবান ও নিবেদিত প্রাণ একজন মানুষ ছিলেন। তার এক বছরের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় তার পিতা-মাতা এবং স্ত্রী আহমদীয়াতভুক্ত হন।" [রেজিস্টার রেওয়ায়েতে সাহাবা, গায়ের মাতবু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০৫-৩০৬, রেওয়ায়েত হযরত গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.), পুত্র আলী বখশ সাহেব, সাং-কাদেরাবাদ, জেলা অমৃতসর]

এরপর লালিয়াঁ নিবাসী হাফিয মুহাম্মদ হায়াত সাহেব 'লালিয়াঁয় আহমদীয়াত' শিরোনামে এক প্রবন্ধ লিখেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন দেখার পর হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, ১৮৯৪ সনে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত এই নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার ফলে স্বভাবতই মানুষের হৃদয়েও একইভাবে অনুসন্ধিৎসা জাগে যে, ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়েছেন আর কিয়ামত আসন্ন প্রায়।

বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এ জন্য মানুষের হৃদয়ে এ ভয়-ভীতি বিরাজমান ছিল যে, কিয়ামত এসে গেছে,এখন কী হবে? সে যুগে এ সব নিদর্শন নিয়ে প্রায়শই আলোচনা হতো। যেমন হাফিয মুহাম্মদ লক্ষ্ণু তার 'আহওয়ালুল আখেরা' গ্রন্থে পাঞ্জাবী কবিতায় ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। অনুরূপভাবে, লালিয়াঁর এক পীর এবং সূফী কবি মিয়া মুহাম্মদ সিদ্দীক লালী সাহেবও এই নিদর্শনগুলোর কথা তার এক কবিতায় উল্লেখ করেন। (অর্থাৎ, এসব নিদর্শন সম্পর্কে এতে লিখেছিলেন) ত্রয়োদশতম রাতে চাঁদে এবং সপ্তবিংশতম দিনে সূর্যে গ্রহণ লাগবে, এখানে সপ্তবিংশতম লিখা হয়েছে, আসলে অষ্টাবিংশতম হওয়া উচিত। এটি মূল পাঞ্জাবী পংক্তিগুলোর অনুবাদ।

যাহোক, তিনি বলেন, ঘরে ঘরে এই নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা হতো এবং সাধারণ মানুষের কাছে ইমাম মাহদীর আগমন প্রত্যাশিত ছিল। সেই দিনগুলোতে মৌলানা তাজ মাহমুদ সাহেব এবং আরো কয়েকজন বুযূর্গ পরস্পর পরামর্শ করেন এবং একটি প্রতিনিধি দল গঠন করেন, যারা কাদিয়ানে গিয়ে মাহদী (আ.)-কে দেখবেন এবং প্রতিশ্রুত মাহদী সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে যেসব লক্ষণের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো দৃশ্যমান হওয়ার বিষয়টি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যাচাই করে দেখবেন আর তা পূর্ণ হয়ে থাকলে তার হাতে বয়আত গ্রহণ করবেন। সেই প্রতিনিধি দলের জন্য যেসব ব্যক্তিবর্গ মনোনীত হন

তারা হলেন, শেখ আমীরুদ্দীন সাহেব, মিয়া ছাহেব দ্বীন সাহেব এবং মিয়া মুহাম্মদ ইয়ার সাহেব। এই প্রতিনিধি দল পায়ে হেঁটে যাত্রা করে। পথ খরচ হিসেবে এদের উভয়ের কাছে তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রায় শুধুমাত্র দেড় রুপি ছিল। (কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুধু দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল গিয়েছিল, মিয়া ছাহেব দ্বীন এবং শেখ আমীরুদ্দীন সাহেব। যাহোক, তিনি বলেন, তাদের উভয়ের কাছে শুধু দেড় রুপী ছিল)আর তখন ছিল মার্চ মাস, গম পাকার মৌসুম। দৈনিক তারা দশ-বারো মাইল পথ পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিতেন। ক্ষুধা লাগলে কৃষকের পাকা গমের ক্ষেত থেকে গম তুলে তা ভাজি করে খেয়ে নিতেন আর এভাবেই তাদের দিন কাটত। কাছাকাছি কোন জনবসতি বা ঘর পেয়ে গেলে সেখানেই রাত কাটাতেন।

যাহোক, এভাবে শত শত ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে (প্রায় দেড় শতাধিক বা পৌনে দুই শত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে) এই দুই সাথী, (কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে এই তিন সাথী) বাটালার কাছে পৌঁছলে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর শিষ্যদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তাদের কাছে কাদিয়ান যাওয়ার রাস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা কাদিয়ানে যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চায়। উদ্দেশ্য জানার পর, তার শিষ্যরা কাদিয়ান যেতে বারণ করে আর বলে, যে ব্যক্তি মাহদী হওয়ার দাবি করেছে, সে তো (নাঊযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী। কেননা, সে একটি নয়, বরং সাতটি দাবি করে বসেছে, তোমরা কোন্ কোন্ দাবির উপর ঈমান আনবে? তাই এখান থেকেই ফিরে যাও। একথা শুনে শেখ আমীরুদ্দীন সাহেব উত্তর দেন। (তিনি লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু খুবই সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন,) সাতটি ভিন্ন ভিন্ন দাবি করলেও তিনি সত্যবাদী। তার তো আরও দাবি করা বাকি আছে এবং তিনি নিজের জ্ঞান অনুসারে এই যুক্তি উপস্থাপন করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তোমরা এখানে সাত জন আর আমি একা। তোমরা সবাই আমার সাথে প্রতিযোগীতা বা কুস্তি কর। আমি যদি তোমাদের সবাইকে ধরাশায়ী করি তাহলে কি আমি একজন হলাম না সাত জন? অর্থাৎ, আমি সাত জনের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হলাম। তিনি বলেন, যুগ ইমামকে তো সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মোকাবিলা করতে হবে, তাই তার দাবি আরো বেশি থেকে থাকবে। এটি শুনে তাদের সবাই নির্বাক হয়ে যায় এবং রেগে গিয়ে বলে, তোমাদের যেখানে খুশি যাও, কিন্তু এরপরও তারা পথ দেখিয়ে দেয়নি।

তিনি বলেন, আমরা কিছু দূর অগ্রসর হই। এক শিখের চায়ের দোকান ছিল। তিনি চা, বিস্কুট ইত্যাদি পরিবেশন করেন। শেখ সাহেব বাটালভী সাহেবের শিষ্যদের ঘটনা এবং তাদের আচার ব্যবহারের কথা শিখ ভদ্রলোকের কাছে উল্লেখ করেন। এতে তিনি আক্ষেপ করেন। সেই শিখ বলেন, আসুন! আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা অবশ্যই কাদিয়ান যান। মনে হয় তাঁর দাবি সত্য [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে তিনি বলেন]। এরপর আরো বলেন, আমরা মির্যা সাহেবকে চিনি। এরপর সেই শিখ ভদ্রলোক অনেক দূর পর্যন্ত তাদের সাথে যান এবং সেই রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন, যা সোজা কাদিয়ান পর্যন্ত গিয়েছে। তখন কাদিয়ান যাওয়ার কোন পাকা রাস্তা ছিল না। এই উভয় বন্ধু কাদিয়ানে সেই সময় পৌঁছালেন,যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদ মোবারকে বসা ছিলেন আর সেখানে একটি বৈঠক চলছিল। কয়েক জন অ-আহমদী আলেম এবং পীর সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, যাদের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কথা বলছিলেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছিলেন। একই সাথে তিনি লেখার কাজেও ব্যস্ত ছিলেন, এটিও এক নিদর্শন, একদিকে তিনি (আ.) লিখছেন অর্থাৎ, তাঁর কলম চলছে, অদৃশ্য থেকে কোন প্রবন্ধ যেন তাঁর হৃদয়ে নাযেল হচ্ছে আর অপরদিকে বৈঠকে উপস্থিত লোকদের সাথে কথাবার্তাও হচ্ছে তথাপি তার লেখায় কোন ব্যত্যয় ঘটছে না।

আগত এই সঙ্গীদেরকে হুযূরের সাথে পরিচয় করানো হয়। শেখ সাহেব বলেন, হুযূর! আমরা লালিয়াঁ থেকে এসেছি। হুযূর জিজ্ঞেস করেন, লালিয়াঁ কোথায়? (অধিকাংশ লোকেরই জানা থাকবে আর যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি, লালিয়াঁ রাবওয়াহ্ থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম, যা এখন শহরে রূপ নিয়েছে। যাহোক, তারা সেসময় এখান থেকে গিয়েছিলেন।) তখন বৈঠকে হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)ও বসেছিলেন, যিনি ভেরার অধিবাসী ছিলেন, তাই তিনি লালিয়াঁ সম্পর্কে জানতেন। তিনি বললেন, হুযূর! লালিয়াঁ কাড়ানা এবং লাকবার-এর পাশে অবস্থিত। তখন হুযূর (আ.) বলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই লাক এবং লালী। (যেহেতু লালী সংক্রান্ত পংক্তি তিনি (আ.) আগেই শুনেছিলেন, হয়তো তাই স্মরণ হয়।)

হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) বলেন, হুযূর! এরা আমাদের প্রতিবেশী। যেহেতু শেখ সাহেব এবং ছাহেব দ্বীন সাহেব নিরক্ষর ছিলেন তাই (তারাও পাঞ্জাবীতে বলেন,) হ্যাঁ হুযূর! আমরা তার প্রতিবেশী। এরপর তারা সফরের পুরো বৃত্তান্ত এবং ঘটনাবলী হুযূরের সামনে উপস্থাপন করেন। বাটালভী সাহেবের শিষ্যদের ঘটনা শুনে হুযূর বলেন, দেখ এক নিরক্ষর ব্যক্তি কত সুন্দর উত্তর দিয়েছে। নির্বাক করে দিয়েছে। তাকে কে শিখিয়েছে? খোদা তা'লা স্বয়ং তাকে শিখিয়েছেন। হুযূর (আ.) এই বাক্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। এরপর হুযূর তাদেরকে বলেন, আপনারা কিছুদিন আমাদের কাছে অবস্থান করুন। তিন দিন পর্যন্ত তারা হুযূরের সান্নিধ্যে অবস্থান করেন, হুযূরের সাথে পদভ্রমণেও যেতেন। লালিয়াঁর আলেমরা যেসব

আজকের এ গ্রহণটি সেই নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের আরেকটি কারণ হল, আজ জুমুআর দিন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথেও জুমুআর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মার্চ মাস হওয়ার সুবাদেও এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কেননা, আর তিন দিন পর এ মাসেই অর্থাৎ, ২৩ মার্চ তারিখে মসীহ্ মওউদ দিবসও রয়েছে। তিনি দাবিও করেছেন এ দিনে। এক কথায় এই মাস, এই দিন এবং এই গ্রহণ, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত স্মৃতিপটে জাগ্রত করে।

নিদর্শনের কথা বলেছিলেন, তারা তা খতিয়ে দেখেন। স্বচক্ষে সেসব নিদর্শন পূর্ণ হতে দেখেন। অবশেষে ফিরে যাওয়ার পূর্বে মসজিদে উপস্থিত হয়ে হুযূরকে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সালাম [যা তিনি (সা.) তাঁর মাহ্দীকে পৌঁছানোর তাকিদপূণ নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, তা] পৌঁছে দেন। এরপর তারা বয়আতের অনুরোধ করেন। হুযূর বলেন, এখানে আমাদের সাথে আরো কিছুদিন অবস্থান করুন। একথা শুনে শেখ সাহেবের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং তিনি নিজের পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হুযূর (আ.)কে দেখান এবং বলেন, এত দীর্ঘ সফর করে আমাদের পা ফুলে গেছে। অনেক কষ্ট আমরা সহ্য করেছি এবং আমরা আপনাকে সত্য মাহদী হিসেবে পেয়েছি। জানিনা, আয়ু পাব কি-না, তাই আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন। এরপর মসজিদে মোবারকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে তারা বয়আত করেন। (মাহ্নামা আনসারুল্লাহ্, রাবওয়া, জুন ১৯৯৫, পৃ. ৩২-৩৪)

আসাদুল্লাহ্ কোরাইশী সাহেব হযরত কাজী মুহাম্মদ আকবর (রা.) সম্পর্কে লিখেন, হযরত কাজী সাহেব (রা.) আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন ঝিলামী (রা.)-এর সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। তিনি নিজ এলাকার ইমাম ছিলেন। এলাকার লোকদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং পাঠদানের কাজে রত থাকতেন। এমন সময় আকাশে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হয়। নিদর্শনমূলক এ ঘটনা ঘটার পূর্বেই তিনি অবহিত ছিলেন যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় সন্নিকটে। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সুমহান নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পর তাঁর শিষ্য এবং বন্ধু-বান্ধবের মাঝে এটি নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। তার এক পৌত্র বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আমি মিয়া মাঙ্গা সাহেবের কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা কাজী সাহেবের কাছে পড়তাম। সেই সময় রমযানে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয়ে গেল। তখন কাজী সাহেব বলেন, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, এখন আমাদের উচিত তাঁর সন্ধান করা। সেই সময় চারকোটবাসী লোকজন বাজার-সওদা করতে ঝিলাম যেত। কাজী সাহেব ঝিলাম গমনকারী লোকদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করুন, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন তো প্রদর্শিত হয়েছে, এখন আপনি ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে আমাদেরকে পথের দিশা দিন। অতএব, তারা হযরত মৌলভী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত মৌলভী সাহেব কয়েকটি বই এবং একটি পত্র কাজী সাহেবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। বই-পত্র হস্তগত হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ তাকে পড়ার জন্য তিনটি পুস্তক দিয়েছে। তার মধ্য থেকে প্রথম বইটি তিনি পড়ার উদ্দেশ্যে খুলে দেখেন, তা আবর্জনায় ভরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত। তাই তিনি সেই বইটি ছুঁড়ে ফেলে দেন। এরপর তিনি বাকি দুটি বই খুলে দেখেন, তা থেকে দ্যুতিময় জ্যোতির ছটা বেরুচ্ছে। হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন (রা.)-এর প্রেরিত পুস্তক হস্তগত হওয়ার পর তার স্বপ্ন এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, হযরত মৌলভী সাহেব তাকে যে সব বই পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির খণ্ডনে লেখা হয়েছিল। তিনি প্রথমে সে বইটিই পড়তে আরম্ভ করেন। এই বইতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে মর্মপীড়াদায়ক শব্দ দেখার পর তিনি তা পাঠ করা বন্ধ করে দেন এবং ছুঁড়ে ফেলে দেন। আর অন্য দু'টো বই এবং পত্র পাঠ করার পর সেগুলোকে হুবহু নিজের স্বপ্ন-সম্মত দেখতে পান এবং সত্য অনুসন্ধানের অধিক প্রেরণা তার মাঝে সৃষ্টি হয়।

তাই তিনি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল কাদিয়ান প্রেরণ করেন। আর তাদের তিন জনই কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, যেভাবে অন্যান্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রে সবার সাথে ঘটেছে, ঠিক একইভাবে এই প্রতিনিধি দলও যখন বাটালায় পৌঁছে, তখন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাদেরকেও বাঁধা দেয়। কিছুটা আতিথেয়তাও করে এবং বলে, আপনারা অনর্থক বেশ কয়েক দিন পায়ে হেঁটে সফরের কষ্ট সহ্য করে কাদিয়ান যাচ্ছেন। আপনারা যেহেতু দূর-দূরান্তের অধিবাসী তাই আপনারা সঠিক জ্ঞান রাখেন না। মির্যা সাহেবের পুরো কাজই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আপনারা ফিরে যান। মৌলভী সাহেব তাদেরকে শুধু এ কথাই বলেন নি, বরং ফেরত যাওয়ার জন্য শহরের শেষ প্রান্তে নিয়ে রেখে আসে।

কিন্তু তার কাছ থেকে আলাদা হওয়ার পর এই তিনজনই ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে কাদিয়ান পৌঁছেন এবং সেখানে এসে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বয়আত করেন। এরপর কাজী সাহেব প্রথমে লিখিতভাবে বয়আত করেন এবং পরবর্তীতে কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। (তারিখে আহমদীয়াত, জম্মু ও কাশ্মীর, রচয়িতা আসাদুল্লাহ্ কুরাইশী সাহেব, পৃ. ৫৭-৫৯)

এরপর হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের দাদা কাজী মওলা বখ্‌শ সাহেব, যিনি জলন্ধর জেলার নাওয়াঁ শহর তহসিলের সুপরিচিত আহলে হাদীসের খতীব ছিলেন। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি তার এক খুতবায় রমযান মাসের ১৩ এবং ২৮ তারিখে যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের বিস্তারিত উল্লেখ করে সুস্পষ্ট করেন যে, এটি ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণ। কাজেই,এখন আমাদের উচিত,প্রতিশ্রুত ইমামের জন্য এ অপেক্ষায় থাকা যে, তিনি কখন এবং কোথা থেকে আবির্ভূত হন? শ্রোতাদের উপর এই খুতবার সুগভীর প্রভাব পড়ে। অতএব, মোহতরম কাজী সাহেব (অর্থাৎ, কাজী মওলা বখ্‌শ সাহেব, যিনি মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের দাদা ছিলেন) যদিও তিনি নিজে সত্য গ্রহণের সুযোগ পাননি কিন্তু তার বড় পুত্র অর্থাৎ, মওলানা আবুল আতা সাহেবের পিতা জনাব মিয়া ইমামুদ্দীন সাহেব দাবিকারকের আগমণ সংবাদ পান এবং কিছু অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তা-ভাবনার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে সত্য পান এবং তাঁর হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। (মাহ্‌নামা আল ফুরকান, অক্টোবর ১৯৬৭ই, পৃ. ৪৩, উদ্ধৃতি মাহ্‌নামা আনসারুল্লাহ্, রাবওয়া, মে ১৯৯৪, পৃ. ৮৪)

দুররে সামিন (কবিতা গুচ্ছ-এর) সুপ্রভাব

হযরত গোলাম মুজতবা সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০১ সনে হংকং-এ চাকুরিরত থাকাকালে কাব্যগ্রন্থ দুররে সামীন আমার দৃষ্টিগোচর হয়। যেহেতু যুগ একজন সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল তাই, যুগের আলেমদের মাঝে এমন মতভেদ বিরাজমান ছিল যে, প্রত্যেক সুস্থ চিন্তার অধিকারী ব্যক্তি এই মতভেদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে একজন সংস্কারকের সন্ধানে ছিল। দুররে সামীন এর পঙক্তি পড়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয়ে থাকলে এটি তাঁর পরম সৌভাগ্য। নতুবা সে মিথ্যা বলাতেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে (অর্থাৎ, এত উন্নত মানের বই লিখেছে।) সেই সময়েই ইযালায়ে আওহাম পুস্তকটিও আমার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এটি জানা যায় নি, কে এই বইগুলো হংকং পাঠিয়েছেন? পুরো ইযালায়ে আওহাম বইটি আমি পড়ে ফেলি এবং এরপর হংকং মসজিদের ইমামের সাথে আমি এই পন্থায় যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে থাকি। হংকং মসজিদের ইমামের কাছে নিয়ামত উল্লাহ্ ওলী সাহেবের কাসীদা ছিল, যা ফার্সী ভাষায় রচিত, উক্ত কাসিদা পাঠে আমরা বুঝতে পারতাম, মাহদীর আবির্ভাবের যুগ সন্নিকটে, বরং এটিই সেই যুগ। এছাড়া আমার মরহুম পিতা একজন মুফতী ছিলেন। রমযান মাসে যখন সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হয়ে গেল, তখন আমার পিতা বলেন, মাহদী (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেছে। [রেজিস্টার রেওয়ায়েতে সাহাবা, গায়ের মাতবু, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৬, রেওয়ায়েত হযরত গোলাম মুজতবা (রা.), রাসূলপুর, তহসীল-খারইয়া, জেলা গুজরাট]

মওলানা ইবরাহীম বাকাপুরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, দুই ব্যক্তি যারা পিতা-পুত্র ছিলেন, তারা মৌলভী আব্দুল জব্বার সাহেবের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব সংক্রান্ত সেই হাদীস যাতে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কথা রয়েছে, তা সঠিক কি-না? মৌলভী সাহেব বলেন, হাদীস তো সঠিক কিন্তু মির্যা সাহেবের ফাঁদে পা দিবে না। কেননা, তিনি এই হাদীসকে তাঁর দাবির সত্যায়নে উপস্থাপন করেন। আর এই হাদীস ইমাম মাহদীর দাবির সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ নয়, বরং জন্ম সংক্রান্ত। পিতা বলেন, মৌলভী সাহেব! আমি আপনাকে যেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, আপনি তার উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। বাকি থাকল এ কথা যে, এটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? এ সম্পর্কে আমার নিবেদন হল, আমার সারা জীবন মামলা-মোকদ্দমায় কেটেছে কিন্তু সরকার আমাকে কখনো সাক্ষী আনতে বলত না, যতক্ষণ না আমি প্রথমে দাবি করতাম। মির্যা সাহেবেরও একই অবস্থা। তিনি তো পূর্বেই দাবি করে রেখেছেন আর এখন এই চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ তাঁর দাবির সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এতে মৌলভী সাহেবের মুখ বন্ধ হয়ে যায় আর এই পিতা-পুত্র উভয়েই নিজ গ্রামে ফিরে যান। [রেজিস্টার রেওয়ায়েতে সাহাবা, গায়ের মাতবু, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪, রেওয়ায়েত হযরত মাওলানা ইব্রাহীম বাকাপুরী (রা.)]

আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সত্য গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। আর যুক্তি-প্রমাণও আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষনিকভাবে শিখিয়ে থাকেন।

সৈয়্যদ নযীর হোসেন শাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, চন্দ্র-গ্রহণ আর সূর্য-গ্রহণ যখন লাগে তখন আমি আমার ঘরে ছিলাম। আমার পিতা বলছিলেন, এটি হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার নিদর্শন। আমার হৃদয়ে এ কথার সুগভীর প্রভাব পড়ে। [রেজিস্টার রেওয়ায়েতে সাহাবা, গায়ের মাতবু, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭, রেওয়ায়েত হযরত সৈয়্যদ নযীর হোসেন শাহ্ (রা.) ঘাটিয়ালিয়া, জেলা শিয়ালকোট]

এরপর তিনি বয়আত হওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করেন। সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব বলেন, "সেই যুগে সবার মুখে-মুখে একথাটি ছিল যে, মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীও শেষ। এটি সেই যুগ, যখন হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আগমন করবেন এবং তাঁর পর হযরত ঈসা (আ.)ও আগমন করবেন। অতএব, আমার মা এই মাহদী এবং ঈসার আগমনের কথা বড় আনন্দের সাথে বলতেন, সেই যুগ ঘনিয়ে আসছে আর একথাও বলতেন যে, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হওয়া মাহদীর যুগের জন্য অবধারিত ছিল আর সেই গ্রহণও হয়ে গেছে। [রেজিস্টার রেওয়ায়েতে সাহাবা, গায়ের মাতবু, ১১তম খণ্ড, পৃ. ১৪২-১৪৩, রেওয়ায়েত হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ্ (রা.) সাং-সাহালাহ্, জেলা রাওয়ালপিন্ডি]

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা পুরো পরিবারকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন।

হযরত মির্যা আইয়ূব বেগ সাহেব বলতেন, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী 'দারে কুতনী' ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে মাহ্দীর লক্ষণস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ১৮৯৪ সালের মার্চে রমযান মাসে প্রথমে চন্দ্র গ্রহণ হয়। একই রমযানে যখন সূর্য গ্রহণ হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসে তখন উভয় ভাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সেই নিদর্শন দেখতে এবং গ্রহণের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে শনিবার সন্ধ্যায় লাহোর থেকে রওয়ানা হয়ে প্রায় রাত ১১টায় বাটালায় পৌঁছেন। পরের দিন প্রত্যুষে গ্রহণ লাগার কথা ছিল। (এখন এই যুবকদের আগ্রহ দেখুন কত সুগভীর।) ধূলিঝড় হচ্ছিল, মেঘের গর্জন ছিল আর বিদ্যুতও চমকাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে ঝড়ো বাতাস বইছিল আর চোখে ধূলিকণা পড়ছিল। (পায়ে হেঁটে বাটালা থেকে তারা কাদিয়ান যাচ্ছিলেন।) পা ফেলাই কঠিন হয়ে পড়ছিল কেননা, বিদ্যুত চমকালে তবেই কেবল রাস্তা দেখা যেত। তার সাথে নিজ গ্রামের এক বন্ধু মৌলভী আব্দুল আলী সাহেবও ছিলেন। (তারা মোট তিন জন ছিলেন।) সবাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন, যাই হোক না কেন, রাত থাকতে থাকতে কাদিয়ান পৌঁছাতে হবে। [তারা পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আর এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে গ্রহণের নামায পড়তে চাচ্ছিলেন।] তাই তাদের তিনজনই রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিগলিত চিত্তে পরম বিনয়ের সাথে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আকাশ এবং পৃথিবীর মালিক, হে সর্বশক্তিমান খোদা! আমরা তোমার দুর্বল বান্দা। তোমার মসীহ্‌র যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমরা বের হয়েছি আর যাচ্ছি পায়ে হেঁটে, শীতও প্রচন্ড এখন তুমিই আমাদের প্রতি করুণা কর আর আমাদের জন্য পথ-যাত্রা সহজ করে দাও। আর প্রতিকূল এই বাতাসকে দূর কর। (তিনি বলেন,) দোয়ার শেষ শব্দটি তখনো মুখেই রয়ে গেছে, এমন সময় ঝড়ো বাতাসের গতিপথ বদলে যায়, সম্মুখ থেকে আসার পরিবর্তে এবার পেছন দিক থেকে বইতে আরম্ভ করে, যা পথ চলায় সহায়ক হয়ে যায় (অর্থাৎ, পেছন দিক থেকে বাতাস এত দ্রুত বেগে বইছিল যে, তাদের সফর সহজ হয়ে যায়। পথচলা সহজসাধ্য হয়।) তারা বলেন, এমন মনে হচ্ছিল যে, আমরা বাতাসে ভর করে উড়ে চলছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নদীর উপকণ্ঠে পৌঁছে যাই। সেখানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়। নদীর তীর ঘেঁসে একটা ঘর ছিল আর আমরা সেই ঘরে ঢুকে পড়ি।

সেই দিনগুলোতে গুরুদাসপুর জেলার অধিকাংশ রাস্তাঘাটে ডাকাতির ঘটনা ঘটতো। দিয়াশলাই জ্বালিয়ে আমরা দেখলাম, ঘর খালি এবং সেখানে পাথরের দুটো চাঁই আর মোটাসোটা একটি ইট পড়ে আছে। আমরা প্রত্যেকে এর এক-একটি করে মাথার নিচে দিয়ে মাটিতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে দেখি, মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ, তারাও দেখা যাচ্ছে। মেঘ বা ঝড়ের কোন নাম-গন্ধও নেই। অতএব, আমরা পুনরায় সেখান থেকে যাত্রা শুরু করি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে বসে সেহ্‌রী খাই। (রমযান মাস ছিল।) সকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সূর্য গ্রহণের নামায পড়ি। মৌলভী মুহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব মসজিদে মোবারকের ছাদে এই নামায পড়ান। প্রায় তিন ঘন্টা পর্যন্ত এই নামায চলে (নামায, খুতবা ইত্যাদি।) অনেক বন্ধু কাঁচে কালির প্রলেপ দিয়ে গ্রহণ দেখায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রথম দিকে কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখতে সামান্য কালো দাগমত দেখাচ্ছিল (অর্থাৎ, গ্রহণ হালকাভাবে শুরু হয়েছিল।)

কেউ একজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, সূর্যে গ্রহণ লেগেছে। তিনি (আ.) কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখেন, খুবই হালকা একটি কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল অর্থাৎ, তখন সবেমাত্র গ্রহণ লাগা আরম্ভ হয়েছিল। হুযূর (আ.) বলেন, এই গ্রহণ তো আমরা দেখলাম কিন্তু এটি এত হালকা যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতা এড়িয়ে যাবে আর এভাবে সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত এক নিদর্শনও সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে। হুযূর (আ.) বেশ কয়েকবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করেন।

কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পর থেকেই সূর্যের উপরকালো যে ছায়া বা গ্রহণের চিহ্ন ছিল, আকারে তা বড় হতে শুরু করে। এমনকি সূর্যের বেশিরভাগ অংশই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। হুযূর বলেন, আজকে আমরা স্বপ্নে পেঁয়াজ দেখেছিলাম। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এর অর্থ হয়, দুঃখ। তাই প্রথম দিকে, ছায়া হালকা থাকার কারণে কিছুটা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আনন্দই দিয়েছেন। [আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২-৯৪, রেওয়ায়েত হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ (রা.)]

মৌলভী গোলাম রসূল সাহেব বর্ণনা করেন, ১৮৯৪ সনে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের দিনগুলোতে আমি লাহোরে মৌলভী হাফিয আব্দুল মান্নান সাহেবের কাছে তিরমিযী শরীফের পাঠ নিচ্ছিলাম। আলেমদের দুশ্চিন্তা ও ভয়-ভীতি আমার হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদিও আলেমরা সাধারণ মানুষকে ছেলে-ভোলানো নিশ্চয়তা দিচ্ছিল,তথাপি ভেতরে ভেতরে তারা ছিল, চরম ভীত ও ত্রস্ত। কেননা, এই সত্য নিদর্শনের কারণে মানুষ খুব দ্রুত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হবে। সেই দিনগুলোতে লক্ষ্ণু কেওয়ালের হাফিয মুহাম্মদ সাহেব পিত্ত পাথরের অপারেশন করতে লাহোরে এসেছিলেন। আমিও তার কাছে যাই। সাধারণ মানুষ যখন তাকে জিজ্ঞেস করে যে, এই নিদর্শনের কথা আপনি আপনার বই 'আহ্ওয়ালুল আখেরাত'-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন আর দাবিকারক হযরত মির্যা সাহেবও বিদ্যমান আছেন এবং এই নিদর্শনকে তিনি তাঁর সত্যতার নিদর্শন আখ্যা দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে আপনার অবস্থান কী? তিনি বলেন, আমি অসুস্থ্য এবং খুবই দুর্বল। আরোগ্য লাভের পর কিছু বলতে পারব, যদিও আমি আমার ছেলে আব্দুর রহমান মহিউদ্দীনকে এই কথা বলে হযরত মির্যা সাহেবের বিরোধিতা করতে বারণ করছি যে, খোদা তা'লার ভেদ বিস্ময়কর হয়ে থাকে। (যা হোক,) তিনি আর আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি, এর অল্পকাল পরই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। (লেখক বলছেন,) এসব কথা শুনে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে যদিও নিশ্চিত হই কিন্তু হাদীসের উৎকর্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্য অমৃতসর চলে যাই। সেখানে দুই-তিন বছর অবস্থান করে হাদীসের দওরা শেষ করার পর দারুল আমানে এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করি। [আসহাবে আহমদ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮, রেওয়ায়েত হযরত মৌলভী গোলাম রাসূল (রা.)]

হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী সাহেব বর্ণনা করেন, ১৮৯৪ সনের পবিত্র রমযান মাসে শেষ যুগের মাহ্দীর আবির্ভাবের কালজয়ী নিদর্শন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ পূর্ণ হয়। সেই দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর সেই শব্দ এখনো আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়, যা এই লক্ষণ পূর্ণ হওয়ার পর আমাদের প্রধান শিক্ষক মৌলভী জামা'ল উদ্দীন সাহেব মাদ্রসার কক্ষে পুরো (ক্লাসের উপস্থিতিতে) বলেছিলেন, 'এখন শেষ যুগের মাহ্দীর সন্ধান করা উচিত। তিনি অবশ্যই কোন গুহায় জন্মগ্রহণ করেছেন। কেননা, তাঁর আবির্ভাবের সুমহান লক্ষণ আজ পূর্ণ হয়েছে।' তিনি বলেন, আমিও সেই ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম। সেই কক্ষ, সেই স্থান, ছেলেদের সেই বৈঠক আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। সেই চেয়ার, যাতে বসে মৌলভী সাহেব এই কথা বলেছিলেন, সেই টেবিল, যাতে চাপড় মেরে তিনি ছেলেদেরকে এই সংবাদ শুনিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমরা অবশ্যই এ কথার স্বাক্ষ্য দিব যে, উল্লেখিত মৌলভী সাহেবের কাছে এই সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই নিদর্শনের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং শেষ যুগের মাহ্দীকে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থেকে যান। (ভাই আব্দুর রহমান সাহেব বলেন,) 'মাহ্দীয়ে আখেরুয্ যামান' নামটি সম্পর্কে আমার কান তখনো অপরিচিত ছিল। 'কোন গুহায় তাঁর জন্মগ্রহণ করা' এবং 'তাঁর আবির্ভাবের বড় লক্ষণ' এই কথাগুলো আমার জন্য আরো বিস্ময়কর ছিল। আমি মাধ্যমিকে পড়ছিলাম। আমার ভেতর অনুসন্ধিৎসা জাগে। শিক্ষকের প্রতি লজ্জা ও শ্রদ্ধাবোধের কারণে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি নি। অবশেষে নিজ ক্লাসের ছাত্র (অর্থাৎ সহপাঠীদের) কাছে এই রহস্যের সমাধান চাই। তারা প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণা অনুসারে আমাকে পুরো কাহিনী শুনায়। এসব কাহিনী শুনে আমার হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং যা আমার আধ্যাত্মিকতা আরো বৃদ্ধি করে তা হল, (দেখুন! অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের চিন্তাধারা কত উর্বর। তিনি বলেন,) প্রথমত: তেরশত বছর পূর্বে এক ঘটনার আগাম সংবাদ দেয়া, যা শত্রু-মিত্র সবার মাঝে সুবিদিত এবং যথা সময়ে তার পূর্ণতা লাভ করা।

দ্বিতীয়ত: যে কথাটি মাথায় আসে তা হল, সেই ঘটনা মানবীয় প্রচেষ্টার কোন ফসল নয়, বরং তা ঘটেছে আকাশে, যা মানুষের নাগালের বাইরে আর এতে মানুষের কোন হস্তক্ষেপেরও সুযোগ নেই।

তৃতীয়ত: যে কথাটি মাথায় আসে তা হল, শেষ যুগের মাহদীর ব্যক্তিত্ব, কুফরকে নিশ্চিহ্ন করা, ইসলামকে উন্নীত করা, ইসলামী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করা এবং মুসলমানদের বিজয়ের চিন্তাধারা পোষণ করা।

চতুর্থ কথাটি হল, দোয়া এবং এর বাস্তবতা অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের দোয়া শ্রবণ করা ও কবুল করা। কেননা, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওলীরা শেষ যুগের মাহদীর জন্য দোয়া করে আসছেন আর অবশেষে তা গৃহীত হয়েছে।

পঞ্চম কথা হল, এ বিষয়গুলো ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর ইসলামই এমন একটি ধর্ম, যা খোদা তা'লার কাছে প্রিয় এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য দানের মাধ্যম।

তিনি বলেন, এই পাঁচটি প্রসঙ্গ, মূল

বিষয়ের অনুষঙ্গ হিসেবে আমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। আর এই ঘটনা আমার ঈমানকে উন্নত ও সতেজ করে তুলে আধ্যাত্মিকতায় বৃদ্ধি ঘটায়। আর আমিও শেষ যুগের মাহদীকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি, তাঁকে পাওয়ার জন্য আমার মাঝে দোয়ার অভ্যাস গড়ে উঠে। আমি রাতেও জেগে থাকতাম আর দিনের বেলায়ও উৎকণ্ঠিত থাকতাম। আর শেষ যুগের মাহদীর সন্ধানের চিন্তা হৃদয়কে দীর্ঘক্ষণ ধরে এমনভাবে গ্রাস করে রাখত যে, অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও আমি অনেক সময় উন্মাদের ন্যায় জনমানবশূন্য পোড়োবাড়িতে চলে যেতাম এবং উদাত্তকণ্ঠে, এমনকি অনেক সময় কেঁদে-কেঁদেও আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেই পবিত্র সত্তাকে পাওয়ার জন্য আকুতি-মিনতি জানাতাম। [আসহাবে আহমদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৯-১৩, রেওয়ায়েত হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী (রা.)]

অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেন এবং তিনি সত্য গ্রহণের তৌফিক লাভ করেন। এছাড়া আরও অনেক ঘটনা রয়েছে।

এরপর ছিলেন, হযরত শেখ নাসিরুদ্দীন সাহেব নামে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী, যিনি ১৮৫৮ সনে জলন্ধরের ইসকান্দারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সম্মান লাভ করেন। তিনি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখতেন কিন্তু আন্তরিক প্রশান্তি ছিল না। মসজিদে আলেমদের কাছে যখন শেষ যুগের অবস্থা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত প্রসিদ্ধ পুস্তক 'আহওয়ালুল আখেরাত' শুনতেন, তখন তার হৃদয় সাক্ষ্য দিত, আগমনকারীর সময় তো এটিই মনে হচ্ছে, কিন্তু ইমাম মাহ্দী কেন আবির্ভূত হচ্ছেন না? অনুরূপভাবে একদিন তিনি একটি মসজিদে নামায পড়ছিলেন। এক মৌলভী খুবই দুশ্চিন্তার সাথে নিজের উরুতে চাপড় মারতে মারতে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলছিলেন, এখন তো মানুষ মির্যা সাহেবকে মেনে নিবে। কেননা, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গ্রহণ লেগে গেছে। তার (অর্থাৎ, মৌলভী শেখ নাসিরুদ্দীন সাহেবের) কানে এই আওয়াজ আসলে তার উদ্বেগ আরো বেড়ে যায় এই ভেবে যে, মৌলভী সাহেব এ কী বলছেন? ভবিষ্যদ্বাণী যদি পূর্ণ হয়েই থাকে, তাহলে তো এটি আনন্দের বিষয়। অতএব, তিনি বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্‌র দরবারে এই বলে দোয়া আরম্ভ করেন যে, হে সম্মানিত প্রভু! তুমিই আমাকে পথ দেখাও। আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখিয়েছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, বিশাল দেহধারী এক ডাইনী তার উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু সেটিকে লক্ষ্য করে তিনি বন্দুকের গুলি ছোড়েন আর তা ধোঁয়ার মত অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর তিনি এক উঁচু জায়গায় মসজিদে বা-জামা'ত নামাযে অংশগ্রহণ করেন। এই স্বপ্ন তিনি এক মৌলভীর সামনে বর্ণনা করেন। সেই মৌলভী সাহেব এর তা'বীর করেন, আপনি শয়তানের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবেন এবং এক পুণ্যবান জামা'তে যোগ দিবেন।

সেই দিনগুলোতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির সংবাদ পান এবং কাদিয়ানে পৌঁছে স্বপ্নে দেখা পরিবেশ মিলে যেতে দেখে বিনা বাক্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। এভাবে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী (এবং মৌলভীর সেসব কথা) তার সত্য পথ লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (তারিখে আহমদীয়াত, জেলা রাওয়ালপিন্ডি, রচয়িতা- খাজা মঞ্জুর সাদেক সাহেব, পৃ. ১৬৩-১৬৪)

বিশ্ববাসী এবং বর্তমান মুসলমানদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা বিবেক-বুদ্ধি দান করুন আর যুগ ইমামের বিরোধিতার পরিবর্তে তাঁকে মেনে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযাও পড়াব। এটি জার্মানীর নাঈম আহমদ বাজওয়া সাহেবের পুত্র জনাব আহমদ ইয়াহিয়া বাজওয়া সাহেবের জানাযা। তিনি জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র ছিলেন। গত ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি ২৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি প্রথমে জামেয়ায় ভর্তি হন কিন্তু অসুস্থতার জন্য পড়ালেখা ছেড়ে চলে যান। দুবছর পর পুনরায় জামেয়াতে ভর্তির ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তাই বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাকে জামেয়ায় ভর্তি করে নেয়া হয়। বর্তমানে দরজা রাবেয়া বা পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ছিলেন এবং খুবই মেধাবী, বিনয়ী ও সত্যিকার ওয়াক্‌ফের চেতনায় সমৃদ্ধ ছাত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার সঙ্গী-সাথীদের খুব সুন্দরভাবে বুঝাতে পারতেন। তার নতুন ও পুরাতন অধিকাংশ সহপাঠীর পত্রই আমার কাছে এসেছে। সবাই তার প্রশংসা করেছেন। সবার পত্রে অভিন্ন যে কথাটি ছিল তা হল, অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, কখনো কারো সাথে ঝগড়া করতেন না, কেউ ঝগড়া করলে তাদের বুঝাতেন, সংশোধনের চেষ্টা করতেন। বরং জামেয়ার একজন স্টাফ-মেম্বার (যিনি শিক্ষক নন, বরং অন্য সাধারণ কর্মচারীদের একজন), যার ধুমপানের অভ্যাস ছিল, এমন সুন্দরভাবে তিনি তার সাথে কথা বলেন যে, তখনই তিনি ধুমপান পরিত্যাগ করেন। সব দিক থেকেই তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বুঝাতেন। সবার সাথেই ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং করুণা ও ক্ষমার চাঁদরে তাকে আবৃত রাখুন। যেমনটি আমি বলেছি, এখনই আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০-১৬ এপ্রিল ২০১৫, ২২তম খণ্ড, সংখ্যা ১৫, পৃ. ০৫-০৯)

জুমুআর খুতবা

প্রকাশনা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদগ্র বাসনা

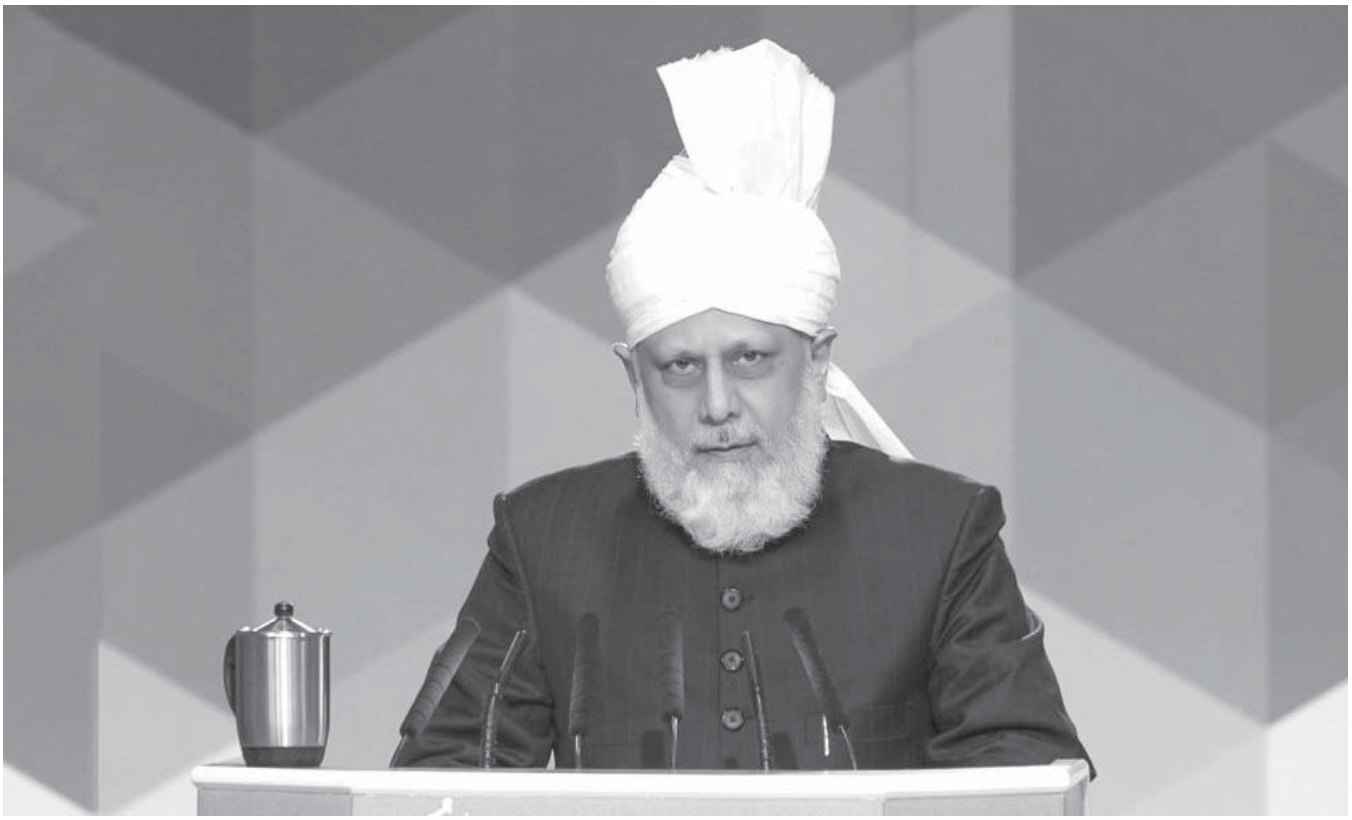

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ মার্চ, ২০১৫ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে পাঁচটি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন, ইশতেহার বা বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ সেগুলোর একটি। অর্থাৎ, তবলীগ এবং সত্য সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার নিমিত্তে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও প্রচার।

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন:

"বিরোধী এবং অস্বীকারকারীদেরকে চূড়ান্ত দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে আজ আমি চল্লিশটি বিজ্ঞাপন প্রকাশে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি, যেন কিয়ামত দিবসে আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এটি প্রমাণরূপে গণ্য হয় যে, যেই কার্যোদ্দেশ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি, তার বাস্তবায়ন আমি সম্পন্ন করেছি।"

(আরবাঈন, ১ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৭, পৃ. ৩৪৩)

ধর্মীয় বিজ্ঞাপন জগতের জন্য এক ধনভান্ডার বিশেষ

আর শুধু কয়েকটি বিজ্ঞাপনই নয়, বা বিজ্ঞাপন শুধু একবারই নয়, বরং পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নিজ দাবির সূচনাকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অগণিত প্রচারপত্র ছেপে তিনি বিতরণ করেছেন। এসব বিজ্ঞাপন বা ইশতেহার ধর্ম জগতের জন্য অমূল্য এক ধনভান্ডার। মুসলমান, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা ছিল। এই কাজ তিনি একাই করতেন এবং এই উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাঁর প্রণীত বড় বড় গ্রন্থ তো আছেই, ছোট ছোট এসব বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও সৃষ্টির প্রতি তাঁর মমত্ববোধ আর পৃথিবীবাসীর সংশোধনের জন্য তাঁর ব্যাথাতুর হৃদয়ের যন্ত্রণাক্লিষ্ট বেদনার প্রকাশ ঘটেছে। তাই জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য তাঁর জামা'তের সদস্যদের অন্তরেও এই মমত্ববোধ লালন করা এবং তা অব্যাহত রাখা উচিত। তাই এ দিকটায় নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ নিবদ্ধ রেখে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

তবলীগের একটি বিশেষ মাধ্যম হচ্ছে বিজ্ঞাপন

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ের এই ব্যাথা এবং এজন্য তাঁর অসাধারণ পরিশ্রম সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন:

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি দিবা-রাত্র কাজে রত থাকতেন এবং বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন লিখে, ছেপে প্রচার করতেন। মানুষ তাঁর কাজ দেখে বিস্মিত হতো। প্রচারিত একটি বিজ্ঞানের জের কাটার পূর্বেই অর্থাৎ এর ফলে সৃষ্ট বিরোধিতার অগ্নি যেভাবে জ্বলে উঠত তার রেশ কাটার পূর্বেই তিনি দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিতেন। এমনকি কেউ কেউ বলত, এমন সময় কোন বিজ্ঞাপন দেয়া মানুষের মন-মস্তিষ্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কিন্তু তিনি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না এবং বলতেন, গরম লোহাতেই আঘাত করতে হয়। আর উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হওয়া শুরু হলেই তাৎক্ষণিকভাবে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিতেন, যার ফলে পুনরায় বিরোধিতার হৈ-চৈ আরম্ভ হয়ে যেতো। এভাবেই তিনি অহর্নিশি কাজ করেছেন, আর সফলতা লাভের মাধ্যম এটিই। আমরাও যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করি, তাহলে সফল হতে পারি। এ কথা ভাবা উচিত নয় যে, বিরোধিতা স্তিমিত হোক।" (দৈনিক আল্-ফযল, কাদিয়ান, ০৯ নভেম্বর, ১৯৪৩, পৃ. ০২, খণ্ড: ৩১, সংখ্যা: ২৬৩)

বিরোধিতার পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের প্রচারও যদি চলতে থাকে, তবেই মানুষের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পুনরায় বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ইশতেহার বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তবলীগ হত। সেসব বিজ্ঞাপন দু'চার পৃষ্ঠা সম্বলিত হোত এবং এর মাধ্যমে দেশে হৈ-চৈ সৃষ্টি করে দেয়া হোত। ব্যাপক সংখ্যায় সেগুলো প্রচার করা হোত। সেই যুগের নিরিখে অজস্র বলতে এক-দু'হাজার বুঝায়। অনেক সময় সংখ্যায় দশ হাজার করে বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হতো, কিন্তু এখন আমাদের জামা'ত পূর্বের চেয়ে বহু গুণ বেশি বা বড় হয়েছে। এখন বিজ্ঞাপনের প্রচার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ লক্ষ কপি হওয়া উচিত। এরপর দেখ! এই বিজ্ঞাপন কীভাবে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পূর্বে যেখানে বছরে ১ বা ২বার বিজ্ঞাপন ছাপানো হোত, সেখানে এখন বছরে দু'তিন বার ছাপানো হয়, আর পৃষ্ঠা সংখ্যা যদি দু'চারেও নামিয়ে আনা হয়, তবু লক্ষ বা দু'লক্ষ সংখ্যায় ছাপানো হয়। এ থেকেও বুঝা যায়, কীভাবে তা গতিসঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ৩৩, পৃ. ৫-৬, আল্-ফযল, ১১ জানুয়ারি, ১৯৫২)

তিন-চার বছর পূর্বে আমি জামা'তগুলোকে বলেছিলাম, এক বা দুই পৃষ্ঠা সম্বলিত তবলীগি লিফলেট প্রচার করুন। আর আমি টার্গেটও দিয়েছিলাম যে, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এটি প্রচার করা উচিত, যার মাধ্যমে পৃথিবী ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হবে। পৃথিবী যেন বুঝতে পারে, ইসলামের বাস্তবতা কী। পৃথিবী যেন এই বার্তা পায় যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করে পুনরায় ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৃথিবীবাসী যেন বুঝতে পারে, এখনও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাদেরকে শয়তানের থাবা থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের মনোনীত ব্যক্তিবর্গকে প্রেরণ করেন। যাহোক, যে সমস্ত জামাত এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে, সেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খুবই ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। জামেয়ার ছাত্রদেরকে আমি স্পেনে পাঠিয়েছিলাম। তারা সেখানে অনেক বড় কাজ করেছে। আর বিভিন্ন ধরনের প্রায় তিন লক্ষ প্রচারপত্র তারা বিতরণ করেছে। অনুরূপভাবে, কানাডার জামেয়ার ছাত্ররা স্পেনিস ভাষাভাষী দেশগুলোতে এবং মেক্সিকো গিয়ে বিজ্ঞাপন বিতরণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এর ফলে তবলীগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে এবং বয়আতও হয়েছে।

অতএব, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বড় বড় বই-পুস্তক বিতরণের পরিবর্তে উপর্যুপরি দুই পৃষ্ঠা সম্বলিত প্যাম্ফলেট ছাপানো এবং বিতরণ করা উচিত।

বিজ্ঞাপন কেমন হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে এক জায়গায় কথা প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ-ও বলেছেন যে, অনেকে নিজেরাই বিজ্ঞাপন প্রচার করতে চায়। সে যুগেও এই মনমানসিকতা ছিল। এখন হুবহু পূর্বের মত করতে না পারলেও

তিন-চার বছর পূর্বে আমি জামা'তগুলোকে বলেছিলাম, এক বা দুই পৃষ্ঠা সম্বলিত তবলীগি লিফলেট প্রচার করুন। আর আমি টার্গেটও দিয়েছিলাম যে, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এটি প্রচার করা উচিত, যার মাধ্যমে পৃথিবী ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হবে। পৃথিবী যেন বুঝতে পারে, ইসলামের বাস্তবতা কী। পৃথিবী যেন এই বার্তা পায় যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করে পুনরায় ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে কিছু না কিছু করতে চায়। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন: "কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়, সেগুলোই বিতরণ করা উচিত, আর এগুলোরই প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। নিজে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে গেলে অনেক সময় হৃদয়ে আমিত্ব দানা বাঁধে যে, এতে আমার নাম হবে। আর এটি এমন এক কঠিন ব্যাধি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে একটি কাহিনী শোনাতেন... [অর্থাৎ আত্মশ্লাঘা বা আত্মম্ভরিতা বা অনেকের আত্মপ্রচারের আগ্রহ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি কাহিনী বর্ণনা করতেন যে,] এমন এক মহিলা ছিল, যে একটি আংটি বানিয়েছিল। কিন্তু কোন মহিলা সেই আংটির প্রশংসা করেনি। এক দিন সেই মহিলা নিজের ঘরে নিজেই আগুন লাগিয়ে দেয়, আর সকল মানুষ যখন সমবেত হয়, তখন সে বলে, কেবল এই আংটিটি-ই রক্ষা পেয়েছে, আর কিছুই রক্ষা পায় নি। কেউ একজন তখন জিজ্ঞেস করে, এটি কবে বানিয়েছ? সে বলে, পূর্বেই যদি এ কথা কেউ আমায় জিজ্ঞেস করতো, তাহলে আজ আমার ঘরটি জ্বলতো না। এক কথায়, খ্যাতি লাভের বাসনার ব্যাধি এমন এক ব্যাধি যে, এতে যে আক্রান্ত হয়, তাকে তা ঘুণের মত কুড়ে-কুড়ে খেয়ে ফেলে, আর এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ বুঝতেই পারে না।" (আহাম অওর যরুরী উমুর, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড: ১৩, পৃ. ৩৪০)

এটি শুধু বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেই নয়, বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও আত্মম্ভরিতা এবং খ্যাতি অর্জনের পোকা যখন মাথায় ঢুকে যায়, আর মানুষ তা অর্জনের জন্য অপচেষ্টা করে, তখন এর ফলে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই হয় বেশি। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তবলীগের ক্ষেত্রে এখন তো এত ব্যাপকতা এসে গেছে যে, কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করে, তাহলে তা যৎসামান্যই হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, নিজের গন্ডিতে আত্মপ্রচারের পিপাসা কিছুটা নিবারণ হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয়ে থাকে, এমন নয় যে, সবাই আত্মশ্লাঘার বশবর্তী হয়েই এমনটি করে, অনেকেই সুস্থ এবং নেক মনমানসিকতা নিয়েও করে থাকে।

কাজেই যেখানে মানুষ নিজের থেকে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে, তাদের মতে এটি যদি ভালো জিনিস হয়ে থাকে, তাহলে একে আরো ব্যাপকভাবে এবং ব্যাপক পরিসরে করা উচিত। কেননা, কারো মাথায় যদি কোন কল্যাণকর ধারণা স্থান পায়, যার ফলে বিজ্ঞাপন উৎকৃষ্টভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, আর আকর্ষণীয় হয় এবং মানুষের দৃষ্টিও যদি আকর্ষণ করে, অধিকন্তু তাতে বিধৃত বিষয়ও যদি উন্নতমানের হয়ে থাকে, তাহলে তা জামা'তের ব্যবস্থাপনার হাতে তুলে দেয়া উচিত। এটি যদি এমন মানের হয়ে থাকে, তাহলে জামা'তের ব্যবস্থাপনা-ই তা ছাপানোর ব্যবস্থা করবে।

এখন সাহাবীদের অথবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কিছু রেফারেন্সেস বা উদ্ধৃতি তুলে ধরব, যা বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেহারা দেখেই বলা যে, এটি মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, "আফগানিস্তানের শহীদদের উপর যখন পাথর বর্ষিত হতো, তখন তারা ভয় পেতেন না, বরং অবিচলতা এবং বীরত্বের সাথে তা মাথা পেতে নিতেন। আর যখন অনেক বেশি পাথর বর্ষিত হতে থাকে, তখন সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ শহীদ, নিয়ামতুল্লাহ্ খান সাহেব এবং অন্যান্য শহীদরা এ কথাই বলেছেন যে, হে আল্লাহ্! এদের প্রতি করুণা কর এবং এদেরকে হিদায়াত দাও। আসল কথা হলো, মানুষের ভেতর যদি প্রেমের অনুরাগপূর্ণ প্রেরণা থাকে, তাহলে তার রীতি-নীতিই বদলে যায়। তার কথায় প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি সৃষ্টি হয়, আর তার চেহারার জ্যোতির্মণ্ডিত কিরণ মানুষকে আকর্ষণ করে।" হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানে) সহস্র-সহস্র

মানুষ এসেছেন। আর তারা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছেন, তখন এ কথাই বলেছেন যে, এটি মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। তাঁর (আ.) মুখ থেকে তারা একটি শব্দও শুনেন নি, তথাপি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।" (আল্লাহ্ তা'লা কে রাসতে মে তাকালীফ, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড: ১৩, পৃ. ৯৬)

এমন দৃষ্টান্ত আজও আমাদের চোখে পড়ে। আমার কাছে অনেক চিঠিপত্র আসে, যাতে উল্লেখ থাকে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখেই বলতে বাধ্য হয়েছি যে, এটি মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না, আর আমরা বয়আত করেছি।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, আমাদের জামা'তে তিন ধরনের মানুষ রয়েছে। তিনি বলেন, "আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- কে একথা বারংবার বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমাদের জামা'তে তিন ধরনের মানুষ রয়েছে। প্রথমতঃ তারা, যারা আমার দাবি বুঝে-শুনে এবং চিন্তা-ভাবনা করে আহমদী হয়েছে।" [সেযুগে ইসলামের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল এবং মুসলমানদের ঐক্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গিয়েছিল। তাই মানুষের স্বভাব এবং প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন আসে, আর এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি এবং স্বভাবের মানুষ যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির কথা শুনে এবং জামা'ত গঠিত হতে দেখে, তখন তারা গ্রহণ করে। হযরত মসীহ্ (আ.) সেসব লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, এরা তিন ধরনের মানুষ। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রথম শ্রেণি হলো তারা,] যারা আমার দাবিকে বুঝে-শুনে এবং চিন্তা-ভাবনা করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। "তারা আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানে এবং বুঝে। আর তারা এটিও বুঝে, যেভাবে পূর্বের নবীদের জামা'ত ত্যাগ স্বীকার করেছে, একইভাবে আমাদেরও ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।

কিন্তু আরেকটি শ্রেণি এমনও আছে, যারা কেবল হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের কারণে আমাদের জামা'তভুক্ত হয়েছে।" [তারা আমার আগমনের উদ্দেশ্য কি, তা জানে না, কিন্তু তারা শুধু এই কারণে জামাতভুক্ত হয়েছে যে, হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন,] "তিনি তাদের শিক্ষক ছিলেন। তারা তাকে সম্মানিত এবং বুদ্ধিমান মনে করত। তারা বলল, মৌলভী সাহেব যেহেতু আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, তাই চলো, আমরাও আহমদী হয়ে যাই। তাই আমাদের জামা'তের সাথে তাদের সম্পর্ক কেবল হযরত মৌলভী সাহেবের কল্যাণে বা সুবাদে। জামা'তের উদ্দেশ্য এবং আমার প্রেরিত হওয়ার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কী, তা তারা বুঝে নি।

এছাড়া যুবকদের সমন্বয়ে একটি তৃতীয় শ্রেণিও রয়েছে, যাদের হৃদয়ে মুসলমানদের জন্য ব্যথা এবং বেদনা যদিও ছিল, কিন্তু সেটি ছিল জাতিগত ভাবে, ধর্মীয় ভাবে নয়। তারা চাইত, মুসলমানদের একটি দল বা গোষ্ঠি থাকা চাই।" (অর্থাৎ ধর্মীয়ভাবে কোন ব্যথা-বেদনা ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে তারা চাইত, তাদেরও একটি জাতি সত্তা বা একটি দল থাকা চাই।) তাই এমন মানুষও জামা'তভুক্ত হয়েছে। এরপর তারা যখন দেখলো, ধর্মের উপর বেশি জোর দেয়া হচ্ছে, তখন বিভিন্ন সময় তাদের অনেকেই পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে তাদের অনেকেই পৃথক হয়ে গেছে।

আজকালও মুসলমান যুবকদের মাঝে যে উদ্দীপনা দেখা যায়, তাতে এদের অনেকেই অন্যায়ভাবে কোন সন্ত্রাসী সংগঠনে গিয়ে যোগ দেয়, তারা শুধু এটিই মনে করে, জাতিগতভাবে আমাদেরও একটি দল থাকা চাই বা এমন একটি গোষ্ঠি থাকা চাই, যার মাধ্যমে মুসলমানদের জাতিসত্তার চেতনাবোধ জাগ্রত হবে, অথচ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এরা কিছুই জানে না। আর ইরাক ও সিরিয়া থেকে যেসব রিপোর্ট আসে, তাথেকে এটিই জানা যায়, তাদের অনেক কাজ এমন, যা কুরআন ও হাদীস সম্মত নয়। সেগুলো সম্পর্কে যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তারা একথাই বলে, আমরা এতকিছু বুঝি না। আমাদেরকে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে, আমাদের যে এক স্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে উঠছে, তা ইসলামের নামে আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অতএব, এমন লোকও রয়েছে। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "তারা জাতিগত ঐক্য চায়। সাংগঠনিক শক্তি গড়তে চায়, সংগঠন গড়তে চায়, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।" (অর্থাৎ তারা জাতিগতভাবে পুণ্য কাজ করতে চায়।) "কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের কোন দল গড়ে তোলা যেহেতু তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, তাই তারা আমাদের একটি দল দেখতে পেয়ে আমাদের জামা'তে যোগ দিল। আর এখন তারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর চায় মানুষ সেখান থেকে ডিগ্রি অর্জন করবে। আর এ কারণেই তারা আমাদের জামা'তকে শুধুমাত্র একটি সংগঠন বলে মনে করে, ধর্মগত অবস্থান তারা বুঝে না। যেসব বিষয়কে জাগতিক উন্নতির কারণ মনে করা হয়, সেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন আর ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যম সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক। জাগতিক সংগঠনগুলো ভিন্নভাবে উন্নতি করে আর ধর্ম অন্যভাবে। ধর্মের উন্নতির জন্য আবশ্যক হলো চারিত্রিক সংশোধন, (ধর্মীয় উন্নতির জন্য চারিত্রিক সংশোধন এবং উন্নত নৈতিকতা আবশ্যক) "ত্যাগ এবং কুরবানীর বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, নামায পড়া আবশ্যক" (যেন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়), "রোযা রাখা আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লার উপর ভরসা বা তাওয়াক্কুলের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, তাঁর আনুগত্য এবং এতায়াতের অঙ্গীকার করা আবশ্যক। যদি আমরা

এসব কাজ করি, তাহলে পৃথিবীর দৃষ্টিতে হয়তো আমরা উন্মাদ আখ্যায়িত হবো, কিন্তু খোদা তা'লার পবিত্র দৃষ্টিতে আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান আর কেউ হবে না। কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানরা যখন আর্থিক কুরবানী করে, তখন মুনাফিকরা বলে, মুসলমানরা হচ্ছে আহাম্মক বা নির্বোধ। অনর্থক টাকা-পয়সা নষ্ট করেছে। নিজেদের টাকা সঠিক কাজে ব্যবহার করার মত কাণ্ডজ্ঞানও তাদের নেই।

অনুরূপভাবে, মুসলমানরা যখন সময়ের কুরবানী করে, তখন এরা বলে, তারা তো পাগল। অনর্থক নিজেদের সময় নষ্ট করছে, এদের উন্নতি সুদূর পরাহত। এক কথায়, মুসলমানদেরকে তারা হয় আহাম্মক বা নির্বোধ আখ্যা দেয়, নয়তোবা তাদের নাম রাখে উন্মাদ বা পাগল। এই দুই নামই তারা মুসলমানদের রেখেছিল। কিন্তু দেখ, এরপর সেই নির্বোধ এবং উন্মাদরাই পৃথিবীর বুদ্ধিমানদের শিক্ষক আখ্যায়িত হয়েছেন। অতএব, আমাদের জামা'ত যতদিন পর্যন্ত সেই নির্বোধদের পন্থা অবলম্বন না করবে, যাকে কাফির এবং মুনাফিকরা নির্বুদ্ধিতা প্রসূত কাজ আখ্যা দিত, আর আমাদের জামা'ত যতদিন সেই উন্মাদদের রীতি অবলম্বন না করবে, যাকে কাফির এবং মুনাফিকরা পাগলের আচরণ আখ্যা দিত, ততদিন পর্যন্ত তারা সফলতা লাভ করবে না। তোমরা যদি প্রয়োজনে মিথ্যা বলতে চাও, আর প্রয়োজনে ধোঁকা, প্রতারণা ও ধূর্ততার আশ্রয় নিতে চাও, আবার যদি তোমরা প্রয়োজনে পরচর্চা ও পরনিন্দা কাজে লাগাতে চাও, আর আশা কর যে, তোমরা সফলতা লাভ করবে, তাহলে স্মরণ রেখ! আদৌ সেই সফলতা লাভ করতে পারবে না, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। এই বিষয়গুলো জাগতিক সংগঠনে নিঃসন্দেহে কাজে আসে।"(ধোঁকা, প্রতারণা, পরচর্চা, পরনিন্দা, কাউকে পদ থেকে অপসারনের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি) কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে এসব থাকলে কোন বরকত হয় না বরং খোদার অভিশাপ বর্ষিত হয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৯, পৃ. ৬৮৬-৬৮৮, আল্-ফযল, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৩)

তাই সকল উন্নত চরিত্র, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি, এগুলো ধর্মীয় জামা'তে হওয়া আবশ্যক। অতএব প্রত্যেক আহমদীর নিজের ঈমান তথা বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার মানকে অনেক উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে।

আহমদীদের নিজেদের ঈমানদারী বা বিশ্বস্ততার মান ও আধ্যাত্মিকতার মান অনেক উন্নত করা আবশ্যক।

তা'লীমুল ইসলাম হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠার পটভূমি

এরপর তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং প্রয়োজন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একটি যুগ এমন ছিল, তালীমুল ইসলাম কলেজের সূচনা যখন হয় তখন চিন্তা ছিল, তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের এত লক্ষ রূপি প্রয়োজন এবং বার্ষিক এত টাকা আয় হওয়া আবশ্যক, যেন কলেজ চালু রাখা যায় আর লক্ষ লক্ষ টাকার পরিকল্পনাও প্রণীত হচ্ছিল। অতএব, সেই সময়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন: "একটি যুগ এমন ছিল, যখন আমাদের জন্য উপরের ক্লাশগুলো চালু করা কঠিনই ছিল। এখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানে) আর্যদের মাধ্যমিক স্কুল ছিল। প্রথম দিকে আমাদের ছেলেরা তাতে যোগ দেয়া আরম্ভ করে। তখন আর্য সম্প্রদায়ের শিক্ষকরা তাদের সামনে লেকচার দেয়া শুরু করে যে, তোমাদের গোস্ত খাওয়া উচিত নয়। (আর্যরা মাংস খায় না) মাংস খাওয়া অন্যায়। তারা এমন অনেক আপত্তি করত, যা ছিল ইসলামের উপর আক্রমণের নামান্তর। ছেলেরা স্কুল থেকে এসে এসব আপত্তি শোনাত।" [তিনি (রা.) বলেন,] "এখানে (কাদিয়ানে) একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, আর তাতেও অধিকাংশ শিক্ষক ছিল আর্য সমাজী। আর তারাও এ কথাগুলোই শিখাত।

প্রথম দিন যখন আমি এই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যাই," [অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের এই ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, যখন আমি সেই সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়তে যাই] এবং দুপুরে আমার খাবার নিয়ে আসে, তখন আমি স্কুল থেকে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গাছের নীচে খাবার খেতে বসলাম। আমার খুব ভালভাবে মনে আছে, সেই দিন কলিজা ভূনা করা হয়েছিল, আর তা-ই আমার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তখন মিয়া ওমর দ্বীন সাহেব মরহুম, যিনি ক্ষৌরকর্মী মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পিতা ছিলেন, তিনিও একই স্কুলে পড়তেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ওপরের ক্লাসে, আর আমি ছিলাম প্রথম শ্রেণিতে। আমি খাবার খেতে বসলে তিনিও সেখানে উপস্থিত হন আর দেখে বলেন, 'আচ্ছা! মাস খাচ্ছ'। অথচ তিনি ছিলেন মুসলমান। এর কারণ ছিল, আর্য শিক্ষকরা শিখাত যে, মাস খাওয়া অন্যায় এবং খুবই ঘৃণ্য একটি কাজ। 'মাস' শব্দটি আমি প্রথমবার তার কাছে শুনেছি। তাই আমি বুঝতে পারিনি যে, মাস বলতে গোস্ত বুঝায়। তাই আমি বললাম, এটি তো মাস নয় বরং কলিজা-গোস্ত। তিনি বলেন, মাংসকেই মাস বলা হয়। অতএব, মাস শব্দটি আমি প্রথমবার তার মুখে শুনেছি আর এমনভাবে শুনেছি যেন মাস খাওয়া মন্দ কাজ, আর তা এড়িয়ে চলা উচিত। এক কথায়, আর্য বা আর্য-সমাজী শিক্ষকরা এমন আপত্তি করত আর ছেলেরা ঘরে এসে বলত, এরা এইসব আপত্তি করে। অবশেষে এই বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন, যেভাবেই হোক না কেন, জামা'তের উচিত কুরবানী করে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। অতএব, প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ধরে নেয়া হয় যে, আমাদের জামা'ত পরম লক্ষ্য অর্জন করেছে।

ইতোমধ্যে আমাদের ভগ্নিপতি নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব মরহুম মগফুর হিজরত করে কাদিয়ান চলে আসেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার গভীর আগ্রহ ছিল তার। তিনি মালির কোটলায়ও একটি মাধ্যমিক স্কুল চালাতেন। তিনি বলেন, আমি চাই, এটিকে (স্কুল) মাধ্যমিকে উন্নীত করা হোক, (অর্থাৎ কাদিয়ানের স্কুলকে) আমি সেখানে স্কুল বন্ধ করে দিব আর সেই সাহায্য এখানে দিয়ে দিব। অতএব, কাদিয়ানে মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর কিছুটা নবাব মোহাম্মদ আলী সাহেব এবং কিছুটা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর আগ্রহের কারণে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এখানে হাই-স্কুল হয়ে যাওয়া উচিত। তাই, এরপর এখানে হাই-স্কুল আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রথম দিকে এই হাই-স্কুল ছিল নামে মাত্র। কেননা, অধিকাংশ শিক্ষক ছিল মেট্রিক পাশ। আর অনেকে হয়তোবা মেট্রিক ফেলও ছিল। কিন্তু যাহোক, স্কুলটি হাইস্কুল নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেশি খরচ করার মত সাধ্য তখন জামা'তের ছিল না, আর এমন কথা ভাবা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু এরপর এমন সময়ও আসে, যখন সরকার এই কথার উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া আরম্ভ করে যে, স্কুল এবং বোর্ডিং নির্মাণ কাজ করা হোক। অধিকন্তু, স্কুল এবং বোর্ডিং-এর নির্মাণ যারা করবে, তাদেরকে সাহায্যও দেয়া হবে। অতএব, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর খিলাফতকালে এই স্কুলও নির্মিত হয় আর বোর্ডিংও। এরপর ধীরে ধীরে স্টাফে পরিবর্তন আসতে থাকে এবং ছাত্রের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। প্রথমে দেড়শত ছিল, এরপর তিন-চারশত হয়, এরপর সাত-আটশত হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা এটিই ছিল। এখন গত তিন-চার বছরে স্কুলে ছাত্রদের সংখ্যাই আটশত থেকে এক লাফে সতেরশত হয়ে গেছে। আর আমি শুনেছি যে, মেয়েদের সংখ্যাও হাজারের বেশি হয়ে গেছে। এক কথায়, ছেলে-মেয়ের সংখ্যা সম্মিলিতভাবে প্রায় তিন হাজার দাঁড়ায়। এরপর মাদ্রাসা আহমদীয়া এবং কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন মাদ্রাসা আহমদীয়াতেও আমার বিগত তাহরীকের আওতায় ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়েছে এবং প্রত্যেক বছর পঁচিশ থেকে ত্রিশজন ছাত্র আসা অব্যাহত আছে। উন্নতির এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে মাদ্রাসা আহমদীয়া এবং কলেজের ছাত্র সংখ্যাও ছয়-সাত'শ পর্যন্ত বা তদুর্ধ্ব হয়ে যাবে। আর এভাবে প্রত্যেক বছর একশত মুবাল্লিগ আমাদের হাতে আসবে। যতদিন প্রতি বছর এই সংখ্যায় মুবাল্লিগ আমাদের হাতে না আসবে, ততদিন পৃথিবীতে সঠিকভাবে কাজ করা আমাদের জন্য সম্ভব হবে না। (অর্থাৎ এটি ছিল ন্যূনতম। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শত শত মুবাল্লিগ পাশ করছে) ১৯৪৪ সনে আমি কলেজের ভিত্তি প্রস্তর রেখেছিলাম, কেননা, তখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উচ্চশিক্ষা লাভ করার দায়ভার হাতে নেয়ার সময় আমাদের হয়ে গিয়েছিল।

একটি যুগ এমন ছিল, যখন আমাদের জামা'তের অধিকাংশ সদস্য ছিল নিম্ন পদের এবং স্বল্প আয়ের মানুষ।"(এর মাধ্যমে জামা'তের ইতিহাসও সুস্পষ্ট হয় যে,) "নিঃসন্দেহে কলেজের কিছু মানুষও আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামা'তভুক্ত হয়েছে, কিন্তু সেটিকে দৈব ঘটনা মনে করা হত। নতুবা, উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন এবং ভালো আয়ের মানুষ আমাদের জামা'তে গুটিকতক ছাড়া খুব বেশি ছিল না। একজন ব্যবসায়ী ছিলেন শেঠ আব্দুর রহমান হাজী আল্লাহ্ রাখ্‌খা সাহেব মাদ্রাজী, কিন্তু তার ব্যবসাও নষ্ট হয়ে যায়। তারপর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন। এছাড়া আমাদের জামা'তে আর কোন বড় ব্যবসায়ী ছিল না। আর কোন বড় ওহ্‌দাদার বা পদাধিকারীও জামা'তভুক্ত ছিল না। এমনকি একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমাকে বলেন, দেখ মিয়া! কুরআন এবং হাদীস থেকে বুঝা যায়, নবীদের উপর প্রথম দিকে বড় বড় লোকেরা ঈমান আনে নি। অতএব, এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি প্রমাণ যে, আমাদের জামা'তে কোন বড় লোক যোগ দেয় নি, তাই কোন ইএসি আমাদের জামা'তে নেই। অর্থাৎ সেই যুগের নিরিখে ইএসি অনেক বড় পদাধিকারী মানুষ হিসেবে গণ্য হতো।" (ইএসি বলতে সরকারী চাকুরে বুঝায়, যাদেরকে হয়তোবা এসিস্টেন্ট কমিশনারও বলা হয়) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "কিন্তু দেখ এখন কত ইএসি এখানে অলিতে-গলিতে বিচরণ করে আর তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু এক সময় আমাদের জামা'তে উচ্চশ্রেণির লোকের এত অভাব ছিল যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমাদের জামা'তে কোন বড় মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয় নি। অর্থাৎ কোন ইএসি আমাদের জামা'তে প্রবেশ করে নি। এক কথায়, সেই সময়ের নিরিখে আমাদের জামা'ত একজন ইএসি-কেও সামলানোর সামর্থ্য রাখতো না।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ২৭, পৃ: ১৫০-১৫৩)

আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সারা বিশ্বে জামা'তের শত-শত স্কুল এবং কলেজ চালু আছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় বড় বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তারা জামা'তভুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের সাংসদরা আহমদী, আর তারা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায়ও সমৃদ্ধ। এমন নয় যে, তাদের মাঝে শুধু বস্তুবাদীতাই ছেয়ে আছে, বরং আফ্রিকার কোন কোন দেশে আহমদীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপারাজির মধ্য থেকে এটিও একটি কৃপা যে, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে উন্নতি দান করছেন!

প্রারম্ভিক আহমদীদের উপর কঠোরতা এবং একান্ত প্রাথমিক যুগে খোদা তা'লার কৃপাবারির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন: "এক যুগ এমন ছিল, যখন

আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সারা বিশ্বে জামা'তের শত-শত স্কুল এবং কলেজ চালু আছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় বড় বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তারা জামা'তভুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের সাংসদরা আহমদী, আর তারা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায়ও সমৃদ্ধ।

জামা'ত চতুর্দিক থেকে কোনঠাসা অবস্থার সম্মুখীন ছিল। মৌলভীরা ফতওয়া দিয়েছিলো যে, আহমদীদেরকে হত্যা করা, তাদের ঘর লুটপাট করা, তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, তাদের মহিলাদের তালাক ছাড়াই অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেয়া শুধু বৈধই নয়, বরং পুণ্যের কারণ।" [এই অবস্থা আজও বিরাজমান। কিন্তু সেই যুগে অধিকাংশ আহমদী ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। তাদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করা হতো। মৌলভীদের এই আচরণ সব সময় ছিল এবং আজও রয়েছে। যাহোক, সেই যুগে চরম কঠিন অবস্থা বিরাজমান ছিল, কেননা আহমদীদের সংখ্যা ছিল কম। তিনি (রা.) বলেন,] "আর দুস্কৃতকারী এবং পাপাচারীরা যেহেতু নিজেদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অজুহাত তালাশ করে থাকে, তাই তারা এই ফতওয়ার বাস্তবায়ন আরম্ভ করে দেয়" [অর্থাৎ বিয়ে না করেই মহিলাদের নিজেদের জন্য বৈধ জ্ঞান করে নেয়। অর্থাৎ আহমদীদের কাছ থেকে তালাক নিয়ে নিজেরাই বিয়ে করে ফেলে। তিনি (রা.) বলেন,] "আহমদীদেরকে ঘর থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছিল এবং চাকুরী থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছিল। তাদের সম্পত্তি জবর-দখল করা হচ্ছিল। আর অনেকেই এই সংকট হতে মুক্তির কোন উপায় না দেখে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। আর হিজরতের জায়গা যেহেতু তাদের জন্য কাদিয়ানই ছিল, তাই তাদের কাদিয়ান আসার কারণে আতিথেয়তার ব্যয় আরও বেড়ে যায়। তখন জামা'তের সদস্য সংখ্যা এক-দুই হাজার পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই শত্রুর আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছিল।" (জামা'তের সদস্য সংখ্যা দুই-এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই শত্রুর আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছিল।)

"এক-দুই হাজার মানুষ, যারা সব সময় নিজেদের প্রাণ, নিজেদের সম্মান, নিজেদের সম্পত্তি এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, আর দিবারাত্র মানুষের সাথে ঝগড়া এবং বিতর্কে লিপ্ত, তাদের পক্ষে সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের জন্য অর্থের যোগান দেয়া এবং ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে যারা কাদিয়ান আসে, তাদের আতিথেয়তার ভার বহন করা এবং একইসাথে নিজেদের নির্যাতিত মুহাজির ভাইদের ব্যয়ভার বহন করা এক আশ্চর্যজনক বিষয়।" (এই ইতিহাসও আমাদের সবার জানা থাকা উচিত, এগুলো কোন সামান্য বিষয় নয়।) "শত শত মানুষ উভয় বেলা জামা'তের দস্তরখানে খাবার খেত। আবার কোন কোন গরীব আহমদীকে অন্যান্য চাহিদা পূরণের ব্যবস্থাও করতে হতো। হিজরত করে আগমনকারীদের সংখ্যাধিক্য এবং অতিথিদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অতিথিশালা ছাড়াও (কাদিয়ানের) প্রতিটি ঘর মেহমানখানার রূপ নিয়েছিল।" "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘরের প্রতিটি কক্ষ এক-একটি স্থায়ী ঘরে রূপ নিয়েছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক কক্ষে এক-একটি পরিবার বসবাস করছিল। প্রতিটি কামরা এক একটি পরিবারকে দেয়ায় তা একটি বাড়িতে পরিণত হয়েছিল) যাতে কোন না কোন অতিথি বা হিজরতকারী সপরিবারে অবস্থান করছিল। এককথায়, সেই বোঝা মানবীয় শক্তি এবং সহ্যশক্তির উর্ধ্বে ছিল। প্রত্যেক প্রভাত নতুন পরীক্ষা এবং নতুন দায়িত্ব নিয়ে উদিত হতো, আর প্রত্যেকটি সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত নিজের সাথে নতুন পরীক্ষা এবং নতুন দায়-দায়িত্ব সাথে করে। কিন্তু **"আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু"** (সূরা আয্-যুমার: ৩৭)-এর মৃদু-মন্দ সমীরণ সমস্ত দুশ্চিন্তাকে খড়কুটার ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যেত। আর সেই মেঘ-ঝঞ্ঝা, যা জামা'তের প্রারম্ভিক ইমারতের ভিত্তিকে মূল থেকে উৎপাটনের হুমকি-ধমকি দিত, স্বল্প সময়ের ভেতর তা রহমত এবং কৃপাবর্ষণকারী মেঘে পরিণত হতো। আর তার একেকটি বারি-বিন্দু বর্ষিত হওয়ার সময় "আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু" (সূরা আয্-যুমার: ৩৭) (আল্লাহ্ কী তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়!) -এর শক্তি সঞ্চারী ধ্বনি সৃষ্টি হতো।" (দা'ওয়াতুল আমীর, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড- ৭, পৃ. ৫৬৫-৫৬৬)

অর্থাৎ এত কঠোরতা থাকা সত্ত্বেও দৃঢ় বিশ্বাস এই ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর ইনশাআল্লাহ্ অবস্থার পরিবর্তন হবেই। আজও, বিশেষতঃ পাকিস্তানে এবং অন্য কিছু দেশের মুসলমানদের মাঝে যদিও কিছু উগ্রতা এবং কঠোরতা রয়েছে, পাকিস্তানেই বেশি এবং পৃথিবীর অন্য কিছু দেশেও আহমদীরা সংকীর্ণতার সম্মুখীন হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্যার উৎকণ্ঠা পূর্বের মত নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আর্থিক দিক থেকেও জামা'ত উন্নত এবং অন্যান্য ব্যবস্থাও পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল, যা আল্লাহ্ তা'লার ফযল বা কৃপারাজী প্রকাশ করে চলছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আহমদীয়াত পৌঁছে

গেছে। আহমদীরা এখন হিজরত করে কেবল এক জায়গায় একত্রিত হয় না, বরং সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে। প্রতিকূলতার কারণে তারা বহির্বিশ্বে বেরিয়ে পড়েছে আর বাইরে আসার কারণে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আরও বর্ধিত স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হচ্ছে। আর কিছু সমস্যা দেখা দিলেও "আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু" (সূরা আয্-যুমার: ৩৭)-এর ধ্বনি আজও আমাদের সাপোর্ট বা স্বপক্ষ হিসেবে দণ্ডায়মান রয়েছে।

আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গর বা অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অতএব, আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখি, তাহলে যেভাবে তিনি কখনো আমাদেরকে পরিত্যাগ করেন নি, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা করবেনও না। নিঃসন্দেহে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, আর আহমদীরা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত বা কুরবানী দিয়েই থাকে, কিন্তু প্রতিটি কুরবানী খোদার কৃপাবারি সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের সামনে বিস্তৃত নতুন-পথ উন্মোচিত করে। আমাদেরকে দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা কখনও কার্পণ্য করেন না।

ঐশী সুরক্ষার নিদর্শন

এরপর ঐশী-হিফাযতের নিদর্শন সংক্রান্ত একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী থেকে ঐশী হিফাযতের একটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি। ক্বমর দীন সাহেব, যিনি লাহোর ল'কলেজের প্রিন্সিপাল, তার পিতার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুগভীর সম্পর্ক ছিল। এমনকি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন সময় অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে অনেক সময় তার কাছ থেকে ঋণও নিতেন। (এই ক্বমর দীন সাহেব হিন্দু ছিলেন)। তিনিও হযরত সাহেবের জন্য গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা রাখতেন। ঝিলাম এর মামলার প্রেক্ষাপটে তিনি তার ছেলেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তিনি যেন উকিলের দায়িত্ব পালন করেন। এই আন্তরিকতার কারণ ছিল, তিনি যৌবনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বেশ কয়েকটি নিদর্শন দেখেছিলেন, যখন তিনি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং আরও কয়েকজন বন্ধু মিলে শিয়ালকোট শহরে একসঙ্গে বসবাস করতেন। সেসব নিদর্শনের একটি হলো, এক রাতে তিনি (আ.) বন্ধুদের সাথে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] চোখ খুলে যায়। তাঁর অন্তরে এই ধারণা সঞ্চার করা হয় যে, এই ঘর নিরাপদ নয়। তিনি (আ.) সবাইকে ডেকে ওঠান এবং বলেন, ঘর ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, এখান থেকে সবার এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত। ঘুমের আধিক্যের কারণে কেউ ভ্রুক্ষেপ না করে একথা বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে যে, এটি আপনার সন্দেহমাত্র। কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে, তিনি তাদেরকে ঘুম থেকে আবার জাগান এবং মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করেন যে, ছাদ থেকে কড়-কড় আওয়াজ আসছে, ঘর খালি করে দেওয়া উচিত। তারা বলে, এটি সামান্য ব্যাপার। অনেক সময় কাঠে পোকা ধরলে এমন আওয়াজ হয়েই থাকে। আপনি আমাদের ঘুম কেন নষ্ট করছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, আচ্ছা! ঠিক আছে, আপনারা আমার খাতিরেই বেরিয়ে পড়ুন। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা বের হতে সম্মত হয়।

যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার নিরাপত্তার জন্যই ঘরকে ধ্বসে পড়া থেকে বাঁধা দিয়ে রেখেছেন, তাই তিনি তাদেরকে বলেন, প্রথমে আপনারা বের হন, পরে আমি বের হব। তারা সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বের হন। তিনি (আ.) সিঁড়িতে এক পা রাখতেই ঘরের ছাদ ধ্বসে পড়ে। দেখুন! তিনি (আ.) কোন প্রকৌশলী ছিলেন না যে, ছাদের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারতেন, এটি ধ্বসে পড়ার অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া তিনি জোর করে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে উঠাতে থাকেন, ততক্ষণ ছাদ সঠিক অবস্থানেই ছিল, আর তিনি যতক্ষণ বের হন নি, ততক্ষণ ছাদও ধ্বসে পড়ে নি, কিন্তু যখনই তিনি পা উঠিয়েছেন, ছাদ ভূমিতে ধ্বসে পড়ে। এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, এটি কোন কাক-তালীয় বিষয় ছিল না, বরং হিফাযতকারী সত্তা সেই ঘরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখেন, যতক্ষণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই ঘর থেকে বের হন নি, যার হিফাযত বা নিরাপত্তাদান সেই হাফিয সত্তার দৃষ্টিতে ছিল। তাই, হাফিয বৈশিষ্ট্য এক নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-শক্তি সম্পন্ন অস্তিত্ববান সত্তার সাক্ষ্য বহন করে এবং তাঁরই অস্তিত্বের এ এক জলজ্যান্ত নিদর্শন।" (হাসতীয়ে বারী তা'লা, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড: ৬, পৃ. ৩২৪-৩২৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার অনুরূপ ব্যবহারের আরো একটি ঘটনা তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, একবার আমি অমৃতসর থেকে টমটম গাড়িতে করে যাত্রা করি। অনেক মোটা তাজা এক হিন্দুও আমার সাথে সেই এক্কা গাড়ি বা টমটম গাড়িতে চেপে বসে। সে আমার পূর্বেই এক্কা বা টমটম গাড়িতে উঠে বসে পড়ে আর আরাম-আয়েশের সাথে নিজ পা ছড়িয়ে বসে, এমনকি দ্বিতীয় সিট, যেখানে আমার বসার জায়গা, সেটির পথও বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকে। [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,] তাই, অল্প একটু জায়গায় বড় কষ্টে আমি বসে থাকি। সেই দিনগুলোতে বেশ কড়া রোদ উঠতো, যার ফলে মানুষের চেতনা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। আমাকে রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ব্যবস্থার অধীনে এক খণ্ড মেঘ পাঠিয়েছেন, যা আমাদের টমটম গাড়ির উপর ছায়া দিতে দিতে বাটালা পর্যন্ত আসে। এই দৃশ্য দেখে সেই হিন্দু বলে,

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আহমদীয়াত পৌঁছে গেছে। আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গর বা অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অতএব, আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখি, তাহলে যেভাবে তিনি কখনো আমাদেরকে পরিত্যাগ করেন নি, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা করবেনও না। নিঃসন্দেহে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, আর আহমদীরা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত বা কুরবানী দিয়েই থাকে, কিন্তু প্রতিটি কুরবানী খোদার কৃপাবারি সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের সামনে বিস্তৃত নতুন-পথ উন্মোচিত করে।

আপনাকে তো খোদা তা'লার অনেক বড় বুযূর্গ বলে মনে হয়। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৭, পৃ. ৫৩৪-৫৩৫)

অতএব, খোদা তা'লা স্বীয় বান্দাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন যে, মানুষ বিস্মিত হয়ে যায় কিন্তু শর্ত হল সত্যিকার বান্দা হওয়া। আর এমন মানুষের পরিণাম অবশ্যই শুভ হবে। বাহ্যত, জগত পূজারীদের দৃষ্টিতে তাকে লাঞ্ছিত মনে হবে, কিন্তু পরিণতিতে সে অবশ্যই সম্মান লাভ করবে। বাহ্যত দুর্নামেরও সে ভাগী হবে, কিন্তু পরিণতিতে সে সুনাম লাভ করবে। এক কথায়, তার সূচনা হবে প্রকৃত বান্দা হিসেবে, আর সমাপ্তি ঘটবে খোদার সাহায্যের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রকৃত বান্দা হিসেবে যদি খোদার ইবাদত করা হয় এবং তাঁর বান্দা হওয়া যায়, তবে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য মানুষের সাথী হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক অনিষ্টের মোকাবিলায় আল্লাহ্ তা'লা তার সাহায্য করে থাকেন। নেক প্রভাব সৃষ্টি এবং পুণ্য বন্টন আর নিজ ভক্তদের সংশোধন এবং মানবতার জন্য হৃদয়ে বেদনা লালনের ক্ষেত্রে একজন সাধারণ পীর এবং একজন খোদা প্রেরিত ব্যক্তির মাঝে কী পার্থক্য থেকে থাকে? এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "লুধিয়ানার মুন্সী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তাঁর দাবির পূর্বেই লিখেছেন,

আমরা যুগের রোগাক্রান্তরা তোমারই পথ পানে চেয়ে আছি।

আল্লাহ্‌র খাতিরে তুমি আমাদের চিকিৎসা কর।

তিনি (অর্থাৎ মুন্সী আহমদ জান সাহেব) তার সন্তানদেরকে নসীহত করেছিলেন যে, আমি এখন মারা যাচ্ছি, কিন্তু তোমরা একথা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, মির্যা সাহেব অবশ্যই একটি দাবি করবেন। আর তোমাদের জন্য আমার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ হলো, তোমরা মির্যা সাহেবকে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ তিনি এমন পর্যায়ের এক পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। যৌবনে তিনি নিজ পীরের সেবার জন্য বারো বছর পর্যন্ত সেই চাক্কি চালিয়েছেন, যাতে সাধারণত ষাঁড় যোতা হয়। (পীর সাহেব ষাঁড়ের জায়গায় তাকে একটি চাক্কিতে লাগিয়ে রেখেছিলেন, যেন সেই চাক্কি চলতে থাকে) আর বারো বছর পর্যন্ত তিনি এভাবে আটা পিষতে থাকেন। এরপর তিনি তাকে আধ্যাত্মিকতার পাঠ দিয়েছেন।" (অর্থাৎ বারো বছর পর্যন্ত ষাঁড়ের মতো আটা পিষার পর পীর সাহেব তাকে আধ্যাত্মিকতার কিছু পাঠ দান করেছেন।) তিনি (রা.) বলেন, "যারা রূহানী বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত হতো (সেই যুগে যারা পীর ছিল এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিল) তারাও মানুষকে আধ্যাত্মিক কথা বলার ক্ষেত্রে মারাত্মক কার্পণ্য প্রদর্শন করত। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেবল জগতকে সেসব কিছুই অবহিত করেন নি, বরং তা থেকে সহস্র-সহস্র গুণ বেশি এমন আরো অনেক কথা পৃথিবীবাসীকে জানিয়েছেন, যা সম্পর্কে পৃথিবী পূর্বে অবগত ছিল না। আর এভাবে জ্ঞানকে তিনি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হাদীসে দেয়া সংবাদ অনুসারে পৃথিবী এর মূল্যায়ন করে নি।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ২৫, পৃ. ২৩-২৪)

অতএব, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যারা রূহানী বা পীর, তারা সে ব্যক্তির সামনে দাঁড়াতেই পারে না, যাকে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর সংশোধনের জন্য, বিশেষভাবে পৃথিবীর মানুষের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং তাদেরকে খোদার নিকটতর করার জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং বলেছেন, "যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, তাহলো আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা এবং বিপত্তি দেখা দিয়েছে, তা দূরীভূত করে ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।" তিনি (আ.) আরো বলেন, "ধর্মীয় সত্যতা, যা পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, তাকে

যেন মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেই। আর সেই আধ্যাত্মিকতা, যা প্রবৃত্তির অমানিশায় চাপা পড়েছে, তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করি।"

তিনি বলেন, "আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, সেই খাঁটি এবং উজ্জ্বল একত্ববাদ, যা সকল প্রকার শিরকের মিশ্রণ থেকে মুক্ত, এবং যা এখন হারিয়ে গিয়েছে, জাতির মাঝে যেন পুনরায় এর চারা রোপন করি।" (লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ২০, পৃ. ১৮০)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী হতে পারি। ধর্মীয় সত্যকে চিনে তা যেন মেনে চলতে পারি। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারি, আর তৌহিদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য থেকে আমরা যেন অংশ পাই। পৃথিবীর মানুষকেও আল্লাহ্ তা'লা এই দূরদৃষ্টি দান করুন। আর বিশেষ করে উম্মতে মুসলেমাহ্‌কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদী (আ.)-এর হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা অনুধাবন করে তাঁর হাতে বয়আত করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি জানাযা হলো, করাচীর জনাব চৌধুরী মাকসুদ আহমদ সাহেবের পুত্র জনাব নোমান আহমদ আঞ্জুম সাহেবের, যিনি মালির এক রেফায়ে আম সোসাইটিতে বসবাস করতেন। জনাব নোমান আহমদ আঞ্জুম সাহেবকে করাচীতে আহমদীয়াতের বিরোধীরা ২০১৫ সনের ২১ মার্চ সন্ধ্যা প্রায় পৌনে আটটার দিকে তার দোকানে এসে গুলি করে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সেদিন সন্ধ্যা পৌনে আটটার সময় শহীদ মরহুম তার স্টোর বা দোকানে ছিলেন। দু'জন সশস্ত্র ব্যক্তি স্টোরে এসে গুলি করে। একটি বুলেট বুকে লাগে এবং হৃদপিণ্ড স্পর্শ করে পিঠের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী দোকানদারগণ তার ভাই জনাব ওসমান আহমদ সাহেবকে ফোন করে অবহিত করে এবং উদ্ধার কর্মীদেরকেও অবহিত করে। তাৎক্ষণিকভাবে তারা দোকানে আসে। নোমান সাহেবকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু পথিমধ্যে তিনি শাহাদাত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ।

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াত এসেছিল তার দাদা জনাব চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি মোকাররম চৌধুরী করীম উদ্দীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে বয়আত করেছিলেন। চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেবের পিতা-মাতা তার বয়স অল্প থাকতেই ইন্তেকাল করেন। পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেব কাদিয়ানে স্থানান্তরিত হন এবং বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাও কাদিয়ানেই অর্জন করেন। সেখানেই মোবারক আলী সাহেবের কন্যা সুফিয়া সাদেকা সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি সাহীওয়ালের হাড়িপ্পায় স্থানান্তরিত হন। শহীদ মরহুমের পিতা জনাব মকসুদ আহমদ সাহেব রাবওয়াতেই জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি রাবওয়া থেকেও স্থানান্তরিত হন। শহীদ মরহুমের দাদা চাকুরীর সুবাদে ১৯৬৮ সাল থেকে স্বপরিবারে গুজরাঁওয়ালায় বসতি স্থাপন করেন। ১৯৭৪ সনে গুজরাঁওয়ালাতে যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, তখন আহমদীয়া বাইতুয্ যিকর এর হিফাযত করতে গিয়ে শহীদ মরহুমের দাদা জনাব চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেব, চাচা জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব এবং ফুফা জনাব সাঈদ আহমদ সাহেবও শাহাদাত বরণ করেন। তার পূর্বে এ পরিবারে এই তিন শহীদ ছিলেন। এই পরিস্থিতির কারণে এই পরিবারটি ১৯৭৬ সনে করাচী স্থানান্তরিত হয়।

নোমান আহমদ আঞ্জুম সাহেব ১৯৮৫ সনের ২৬ জানুয়ারিতে করাচীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এমবিএ পাশ করেছেন। এরপর ২০০৮ সনে তিনি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এর ব্যবসা আরম্ভ করেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। একান্ত ঈমানদার, নেক হৃদয়, সচ্চরিত্রের অধিকারী, মিশুক এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত প্রাণ এক যুবক ছিলেন। কর্মচারীদেরকেও ছোট ভাইয়ের মতো দেখতেন। মিঠ্যিতে নগর পারকারে জামা'তের ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ইন্সটিটিউট এবং মিশন হাউসের জন্য কিছু কম্পিউটার এবং কম্পিউটার-সংক্রান্ত জিনিস-পত্র তোহ্‌ফা হিসেবে পেশ করেন। সেখানে নিজেই সিস্টেম ইনস্টল করে দেন।

শহীদ মরহুমের ইচ্ছা ছিল, তার দাদা জনাব চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেব শহীদের নামে একটি কম্পিউটার ইন্সটিটিউট গড়ে তুলবেন, যেন শহীদ দাদার নাম চিরস্থায়ী হয়। আর এই কারণে তিনি মিঠ্যিতে কম্পিউটার ইন্সটিটিউটকে কিছু একসেসরিজ এবং কম্পিউটার, ইত্যাদি তোহ্‌ফা হিসেবে দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অ-আহমদীরাও বলত যে, তিনি এক ফিরিশতা। বর্তমানে রেফায়ে আম সোসাইটিতে মজলিসের কায়েদ হিসেবে জামা'তের খিদমতের তৌফিক পাচ্ছিলেন। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিতেন এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জামা'তের কাজে অংশ নিতেন। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে তাকে সবসময় হুমকী-ধমকী দেওয়া হতো, কিন্তু তিনি তার ছোট ভাইদের সবসময় সাবধান থাকার নসীহত করতেন। ছয় মাস পূর্বে শহীদ মরহুম নিজের ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে আসছিলেন। তখন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা তাকে দাঁড় করিয়ে জিনিসপত্রও ছিনতাই করে নিয়ে যায়, আর টাকা পয়সাও ছিনিয়ে নেয় এবং একই সাথে একথাও বলে যে, আমরা তোমাকে হত্যা করার জন্য এসেছিলাম,

কিন্তু যেহেতু টাকা পেয়ে গেছি, তাই তোমাকে এখন ছেড়ে দিচ্ছি। শহীদ মরহুমের ছেড়ে যাওয়া পরিবার পরিজনের মাঝে পিতা জনাব চৌধুরী মাকসুদ আহমদ সাহেব, মাতা সুফিয়া সাদেকা সাহেবা এবং দুই ভাই যীশান মাহমুদ ও ওসমান আহমদ রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার তথা পিতা-মাতা ও ভাইদেরকে ধৈর্য এবং সহ্য শক্তি দান করুন।

জামা'তের মুয়াল্লেম খুররম আহমদ সাহেব বলেন, শহীদ মরহুম অত্যন্ত নম্রভাষী, স্নেহশীল, জামা'তের খিদমতের প্রেরণায় সমৃদ্ধ এক যুবক ছিলেন। অনেক পরিশ্রম এবং যত্নের সঙ্গে সেখানে কম্পিউটার ইনস্টল করেছেন, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে। বেশ কয়েকবার নগর পারকারে আসতেন। এটি সিন্ধুর এক প্রত্যন্ত অঞ্চল। বেশ কয়েকবার সেখানে যখন পৌঁছতেন, তখন তাকে বলা হতো, আপনি ক্লান্ত; প্রথমে বিশ্রাম নিন, এরপর কাজ করবেন। কিন্তু তিনি সব সময় এ কথাই বলতেন, আমরা মুজাহিদ। শহুরে দেখে আমাদের সম্পর্কে এটি ভাববেন না যে, আমরা কোমল মন-মানসিকতার অধিকারী। সব সময় খিদমতের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। সাবেক আঞ্চলিক কায়েদ মনসূর সাহেব বলেন, যখন তার বয়স বার বছর ছিল, তখন থেকেই আমি তাকে চিনি, তখন তিনি তিফল ছিলেন। সবসময় বড় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে জামা'তী কাজে এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। সবসময় পজিশন পেতেন এবং বলতেন, আমার পজিশন সবসময় প্রথম হয়, আর এর জন্যই চেষ্টা করতেন। কখনও দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন না। স্কুলের পর পিতার ব্যবসায় তাকে সাহায্য করতেন এবং একই সাথে জামা'তী দায়িত্বও পালন করতেন। আর এমন মনে হতো যেন তিনি নিজের ঘর এবং ব্যক্তিগত কাজে ততটা সময় দিতেন না, যতটা জামা'তী কাজের জন্য সময় ব্যয় করতেন। অন্যান্য যুবকদের মতো তিনি কখনও নিজের সময় নষ্ট করেন নি। অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে কথা বলতেন। টমি কালুন সাহেবেরও তিনি আত্মীয়; তিনি বলেন, আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা অনেক চেষ্টা করেছে তিনি যেন পাকিস্তান থেকে বাইরে চলে যান। অনেক জোর দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি পাকিস্তান ছেড়ে আসতে রাজী ছিলেন না।

জামা'তের মুরব্বী ইমরান তাহের সাহেব বলেন, তিনি আমার আত্মীয়ও ছিলেন। বিশ বছরে একবারও আমি তাকে কারো সাথে চিৎকার করে কথা বলতে এবং রুক্ষস্বরে কথা বলতে দেখি নি। তিনি বিনয়, নম্রতা এবং দীনতার প্রতিচ্ছবি ছিলেন। অত্যন্ত ভদ্র ও স্নেহশীল এক মানুষ ছিলেন। কানাডায় তার খালা সম্পর্কের এক আত্মীয়া আছেন। তিনি বলেন, (যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে,) করাচীর পরিস্থিতির কারণে তাকে হিজরত করতে বলা হতো, কিন্তু তিনি সবসময় সর্ব প্রকার পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে মায়ের সাথে পাকিস্তান থাকাই পছন্দ করেছেন। মায়ের প্রতিটি ইচ্ছা এবং চাহিদার প্রতি তিনি খেয়াল রাখতেন।

মশহুদ হাসান খালেদ সাহেব রয়েছেন জামা'তের মুরব্বী, তিনি বলেন, একদিন খাকসার শহীদ মরহুমের সাথে বসে কথা বলছিলাম। শহীদ মরহুম বলেন, সেই সৌভাগ্যবান কারা, যারা শহীদ হয়ে থাকে। হয়তো তার এই বাসনার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা জনাব ইঞ্জিনিয়ার ফারুক আহমদ খান সাহেবের, যিনি পেশাওয়ার জেলার নায়েব আমীর ছিলেন। ফারুক আহমদ খান সাহেব জনাব মাহমুদ আহমদ খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি শূরার পর রাবওয়া থেকে পেশাওয়ার যাচ্ছিলেন। গাড়ির চাকা ফেটে যাওয়ার ফলে দুর্ঘটনায় পতিত হন, আর চাকওয়ালে গাড়ি থেকে বাহিরে সড়কের উপর ছিটকে পড়েন, যার ফলে গুরুতর আঘাত পান। হাইওয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে চাকওয়াল হাসপাতালে পৌঁছিয়েছে, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ফারুক সাহেবের বংশে আহমদীয়াত আসে তার দাদা জনাব আহমদ গুল সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে তিনি লাহোরীদের সাথে যোগ দেন। পরবর্তীতে ফারুক খান সাহেব ১৯৮৯ সনে নিজে বয়আত করেন এবং আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। এরপর তার দুই ভাইও বয়আত করেন। ১৯৫৪ সনে তার জন্ম হয়। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ালেখা সম্পন্ন করেন।এরপর সরকারের মাইনিং ডিপার্টমেন্ট-এ চাকুরী করেছেন। ১৯৮৫ সনে এক আহমদী বংশে তার বিয়ে হয়। খুবই মিশুক, নেক প্রকৃতির এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পেশওয়ার এর সেক্রেটারী ইসলাহ্ ইরশাদ হিসেবেও কাজ করেছেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে মাগফিরাত এবং করুণার আচরণ করুন, আর তার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনকেও ধৈর্য্য এবং মনোবল দান করুন। তিনি স্ত্রী এবং ২৫ ও ১৭ বছর বয়স্ক দু'জন ছেলে এবং এক কন্যা রেখে গেছেন।

(সূত্র: আল্-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, তারিখ: ১৭-২৩ এপ্রিল ২০১৫, খণ্ড: ২২, সংখ্যা: ১৬, পৃ. ০৫-০৯)

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৮ম কিস্তি)

সারাটা মুসলিম ইতিহাসই অনুরূপ কুৎসিত ও ঘৃণ্য ঘটনাবলী দ্বারা ভরপুর হয়ে আছে। শান্তির ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামকেই ব্যবহার করা হয়েছে নির্দোষ মু'মিনদের জীবনের শান্তি নষ্ট করবার কাজে। এই মু'মিনদের অপরাধ হচ্ছে, এরা ইসলামে বিশ্বাসী হলে কি হবে, এরা তো ওদের মত করে বা ওদের স্টাইলে বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ ইসলামের ইতিহাসের গবেষণায় এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামকে স্বয়ং মুসলিমদেরই ওপরে নির্যাতন চালাবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। বিগত চৌদ্দশ' বছর মুসলমানরা যে সমস্ত জিহাদ খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে চালিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী ও অনেক বড় বড় 'জিহাদ' মুসলমানরা চালিয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

এই অধ্যায়টা যে শেষ হয়ে গেছে, তা নয়। এখন পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যা ঘটছে এবং অতটা ঘন ঘন না হলেও সংখ্যালঘু শিয়াদেরও বিরুদ্ধে যা ঘটছে, তা-ই এই সত্যের প্রতি সৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট যে, এই জঘন্য সমস্যাটার মৃত্যু অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।

খৃষ্টধর্মের ক্ষেত্রে তাকালে মনে হতে পারে যে, খৃষ্টানদের হাতে খৃষ্টানদের নির্যাতিত হওয়ার যে ইতিহাস তা অনেক পুরানো হয়ে পড়েছে এবং তা ইউরোপীয় ও আমেরিকান ইতিহাসের ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে গেছে, কিন্তু বিষয়টার ভিন্ন চেহারা ফুটে ওঠবে তখন যখন আয়ার্ল্যান্ডের ধর্মজড়িত রাজনৈতিক বিবাদের প্রতি লক্ষ্য করা যাবে। তাছাড়া, পৃথিবীর অনেক অনেক স্থানে, খৃষ্টান ধর্মের অভ্যন্তরেও সাম্প্রদায়িক বিবাদসমূহের আশংকা রয়ে গেছে, যারা বর্তমানে লিপ্ত হয়ে আছে ভিন্ন ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদে।

আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের প্রতি তাকালে দেখা যাবে যে, ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা অথবা নাইজেরিয়াতে খৃষ্টান-মুসলিম সংঘাত, অথবা মধ্য প্রাচ্যে ইহুদী-মুসলিম সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ইত্যাদি লেগেই আছে। এই সব এবং অনুরূপ আরও অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বর্তমানে সুপ্ত বিপদাকারে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতই ধর্মজগতের গর্ভদেশে বিরাজ করছে।

বলাই বাহুল্য, এই সকল সমস্যা বর্তমানে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হচ্ছে তার সংশোধনের গুরুত্ব তীব্র হয়ে উঠেছে।

ইসলামী পন্থায় কী করে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব সে কথাই আর একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করে আমরা আমাদের কথায় ইতি টানবো।

(১) পৃথিবীর সকল ধর্ম, তা সেগুলো ইসলামে বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, ইসলামের এই মৌলিক নীতি মেনে চলতে হবে যে, আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক এবং আন্তঃধর্মীয় বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাবার জন্য কোন ক্রমেই বল প্রয়োগ করা যাবে না এবং নিপীড়ন চালানো যাবে না। ধর্ম নির্বাচনের এখতিয়ার, তা ঘোষণা করার স্বাধীনতা, তার প্রচার, পালন এবং অনুশীলন করার অধিকার অথবা তা অস্বীকার বা বর্জন বা পরিবর্তন করার স্বাধীনতাকে নিরংকুশভাবে সংরক্ষিত করতে হবে।

(২) এমনকি, যদি অন্যান্য ধর্মগুলো সত্যের সার্বজনীনতার ধারণার সাথে একমত না হয়, এবং এমনকি যদি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইহুদীবাদের অবস্থান থেকে খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়ান ধর্ম, হিন্দুধর্ম, জরথুষ্ট্রীয়ান ধর্ম ইত্যাদি সব ধর্ম যদি মিথ্যাও হয় এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের কিছুই করারও না থাকে, তবু অন্যত্র সত্যের এই অস্বীকার সত্ত্বেও, সকল ধর্মকে এই ইসলামী নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে যে, অপরাপর সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও পবিত্র পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এমন না যে, এটা করতে গিয়ে তাদেরকে তাদের নীতিসমূহের ব্যাপারে আপোষ করতে হবে। এটা স্রেফ একটা মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়। প্রতিটি মানুষের এই অধিকারকে স্বীকার করতে হবে যে, তার ধর্মীয় আবেগ, তার ধর্মীয় অনুভূতি

যেন লংঘিত না হয়, যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

(৩) মনে রাখতে হবে যে, উল্লিখিত নীতি কোন জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে না। এই নীতির সঙ্গে এটাও অনুধাবন করতে হবে যে, ঈশ্বর নিন্দার জন্য মানব-তৈরী শাস্তির কোন বিধান নেই। তবে, এর বিরুদ্ধে নিন্দা জানাতে হবে, এটাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এবং এই অশালীন, ন্যাক্কারজনক এবং ঘৃণ্য ব্যাপারটাকে নিন্দা করার জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে।

(৪) এই শতাব্দীর প্রথম দিকে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় যেভাবে আন্তঃ-ধর্মীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতো, তদ্রুপ সম্মেলনের অনুষ্ঠান করাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করতে হবে এবং তা বহুলাকারে করতে হবে। এই জাতীয় সম্মেলনের মূল ও অপরিহার্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, তা হচ্ছে সংক্ষেপেঃ

(ক) সকল বক্তাকেই এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে, তিনি যেন শুধু তাঁর নিজ ধর্মের ভাল ভাল কথাগুলি বলেন এবং আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো তুলে ধরেন এবং এটা করতে গিয়ে তিনি যেন অপরাপর ধর্মগুলির বিরুদ্ধে কোন নিন্দা-বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন।

(খ) অবশ্য কোন ধর্মের কোন বক্তা চাইলে আন্তরিকভাবে অপরাপর ধর্মগুলিরও ভাল ভাল বিষয়গুলোর উল্লেখ করতে পারবেন, সেগুলোর ওপরে কথা বলতে পারবেন এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বলতে পারবেন যে, কেন সেগুলি তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে।

(গ) এক ধর্মের বক্তা অন্যান্য ধর্মের নেতাদের চরিত্র ও মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। যেমন ধরুন, একজন ইহুদী বক্তা বলবেন রসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক গুণাবলীর ওপরে। এবং এই বিষয়টা এমন যে, তা সব মানুষই তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাস বজায় রেখেই পছন্দ করবেন। একইভাবে, একজন মুসলিম বক্তা শ্রীকৃষ্ণের ওপরে বলতে পারবেন, একজন হিন্দু বলতে পারবেন যীশুখৃষ্টের ওপরে, একজন বৌদ্ধ মূসার ওপরে (আল্লাহ্‌র শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক তাঁদের সকলের ওপরে) ইত্যাদি, ইত্যাদি। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতো আহমদীয়া সম্প্রদায় ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এবং এতে তারা অনেক সুফলও পেয়েছিল, সুখ্যাতিও অর্জন করেছিল।

(ঘ) ওপরে (গ)-তে যা বলা হয়েছে, তার প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না রেখেই বলছি যে, এই জাতীয় ধর্মীয় সভার বা আলোচনার পবিত্রতার রক্ষা করতে হবে এবং তা করতে হবে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে মিলিতভাবেই। আন্তঃধর্মীয় মতাদর্শের আদান-প্রদানকে কোনক্রমেই ধর্মীয় শান্তিতে অন্তর্ঘাত বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, বর্জন করা যাবে না। আলোচনার ধারা-পদ্ধতি যদি মন্দ হয় তবে, তা বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আলোচনাকে কোনমতেই বাদ দেওয়া যাবে না। চিন্তা ধারণা ও মতামতের অবাধ আদান-প্রদানই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবাধিকার, এর প্রয়োজন যোগ্যতমের উত্তরণের জন্যই, এ ব্যাপারে কোনভাবেই আপোষ করা যায় না।

(ঙ) মতপার্থক্যের পরিসর সংকীর্ণ এবং ঐকমত্যের সম্ভাবনা সুপ্রসারিত করার জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয় যে, সকল ধর্মেরই উচিত হবে অপরাপর ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে তাদের স্ব স্ব ধর্মের বিষয়াদি নিয়ে বিতর্ক সীমিত করে ফেলা। সকল ধর্মের উৎস অভিন্ন, –কুরআন শরীফের এই ঘোষণাকে খাট করে দেখলে চলবে না। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে একটা জ্ঞানের জগৎ। সেই জগতকে অন্যসকল ধর্মের উচিত নিজেদের সাথে এবং সমগ্র মানবজাতির স্বার্থে পরীক্ষা করে দেখা, পুংখানপুংখভাবে খতিয়ে দেখা।

(৫) মানবজাতি পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে সকল ভালকাজে এবং পরিকল্পনায় সহযোগিতাকে বাড়াতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। যেমন, খৃষ্টান ও মুসলিম বা হিন্দু ও ইহুদী ইত্যাদি একসঙ্গে মিলেমিশে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট গ্রহণ করতে পারে।

এবং তাহলেই আমরা অতীতের ঋষিদের ও দর্শনিকদের সেই পুরনো ইউটোপিয়ন স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারবো অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে- ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে সকল মানুষকে একই পতাকার তলে একত্রিত করতে সক্ষম হবো।

(চলবে)

“আহমদী” পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র “আহমদী” পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা প্রকাশক বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

২৩ মার্চ: প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর বয়আত দিবস

মৌলবী এনামুল হক রনী

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের সময়

পবিত্র কুরআন পাকে আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেছেন, "ইউদাব্বিরুল আমরা মিনাস্ সামায়ি ইলাল আরযি সুম্মা ইয়ারুযু ইলাইহি ফি ইয়াওমিন কানা মিকদারুহু আলফা সানাতিম্ মিম্মা তাউদ্‌দুন"

অনুবাদ ঃ তিনি (আল্লাহ্) আকাশ হতে পৃথিবীকে (কুরআনী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য) ব্যবস্থা পরিকল্পনা করেন। অতঃপর তা তাঁর (আল্লাহ্‌র) দিকে উঠে যাবে এক দিনে, যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বৎসর।" (সূরা সাজদা ঃ ৬)

এ আয়াত অনুযায়ী এক হাজার বছর পরে আল্লাহ্ পাক এই পৃথিবীতে ঈমানকে সঞ্জীবনী প্রদান করার জন্য এক মহাপুরুষ প্রেরণ করবেন। এ ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে। এই এক হাজার বছর এর গণনা কাল শুরু হবে নবী করীম (সা.)-এর তিনশত বৎসর পর থেকে। কারণ হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "খায়রুল কুরুনী কারনী সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম সুম্মা ইয়াজ্‌হারুল কিয্‌বু"। অর্থাৎ, আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর তার সন্নিহিতগণ, তারপর তার সন্নিহিতগণ অতঃপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে। (নিসাই ও মিশকাত)

আঁ হযরত (সা.)-এর সোনালী যুগ তিনশত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর হতে এক হাজার বছর পরে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব হওয়ার কথা কুরআনের আয়াত সমর্থন করে।

অপর একটি হাদীসে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের নিদর্শনসমূহ প্রকাশের কথা আরো কিছু পূর্বে শুরু হবে বলা হয়েছে। যেমন আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই লক্ষণ সমূহ ২০০ বৎসর পরে দেখা দিবে, যা হাজার বৎসর পরে আসবে। (মিশকাত) অর্থাৎ (১০০০+২০০) = ১২০০ হিজরী সনের পরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নিদর্শন সমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের লক্ষণ

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের নাম মাত্র এবং কুরআনের অক্ষর মাত্র অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আরম্ভরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেতনা ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে। (মিশকাত)

তেমনি হযরত রসূলে করীম (সা.) আরও বলেছেন, 'ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়াতের প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বেড়ে যাবে, প্রকাশ্যে ভ্যবিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে, পুণ্য কাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে। ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারমারি কাটাকাটি বেশি হবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব দেখা দিবে, ভূমিকম্প বেশি হবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে মানুষ গৌরব বোধ করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন হবে, জাতীর নীচ প্রকৃতির লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, উটনী বেকার হবে, এতে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যথাসময়ে প্রকাশিত ও পূর্ণ হয়ে চলেছে আর এসব নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেতেই থাকবে।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর বংশ

কুরআন করীমে বলা হয়েছে, 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম ওয়া হুয়াল আযিযুল হাকীম'। অর্থাৎ, তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন তাদের মধ্য হতে অন্যদের মধ্যেও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি এবং তিনি মহাপরক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা জুমুআ ঃ ৪)

এ আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর

বুরুযী রূপে অপর এক ব্যক্তির আখেরী যুগে আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। হাদীসে নববীতে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম তখন সূরা জুমুআ যার মধ্যে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম' আয়াত আছে অবতীর্ণ হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা কে (যারা এখনো আমাদের সাথে মিলিত হয় নি)? কিন্তু তিনি এর কোন উত্তর দেন নি, এমনকি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন সালমান ফারসিও আমাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালমান ফারসির ওপর হাত রেখে বললেন, ঈমান সূরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেলেও তাদের (পারশ্য বংশের) এক বা একাধিক ব্যক্তি তথা হতে তাকে নামিয়ে আনবেন। (বুখারী কিতাবুত্ তফসীর)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এই জগতের বুকে ঈমানকে প্রতিষ্ঠা করবে ।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জন্মের সম্ভাব্য সময়

কতিপয় হাদীস থেকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জন্মের কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'যখন ১২৪০ বছর অতিক্রান্ত হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহ্‌দীকে পাঠাবেন'। (আল নাজমুস সাকেব, ২য় খন্ড)

এই হাদীসে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন বার্তা ১২৪০ হিজরী সনের পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আল্লামা শা'রানী তার প্রণীত 'আল ইওয়াকিতু ওয়াল জাওয়াহির' পুস্তকে লিখেছেন, ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ১২৫০ সনের শাবান মাসের ১৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করবেন। এখানে জন্মের সন তারিখ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম মাহ্‌দী দাবীর সম্ভাব্য তারিখ

তেমনি 'ফুসুসুল হিকাম' গ্রন্থে হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি (রহ.) লিখেছেন, ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব হিজরী ১২৫১ সনে সংঘটিত হবে। এভাবে অসংখ্য বর্ণনা থেকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জন্ম এবং আবির্ভাব কাল সম্পর্কে জানা যায়।

আল্লামা আবুল খায়ের নূরুল হাসান খান ১৩০১ হিজরী সনে তার গ্রন্থে ২২১ পৃষ্ঠায় লিখেন, ...হয়ত আল্লাহ্ তা'লা আপন ফযল ও আদল এবং রহম ও করম বর্ষণ করবেন আর ৪ থেকে ৬ বছরের মধ্যেই ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আবির্ভূত হয়ে যাবেন। (ইকতাবাতুস সায়া, ২২১ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ, ১৩০১+৬=১৩০৭ হিজরী সনের কথা বলা হয়েছে যখন ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব হবে।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর প্রকৃত জন্ম ও দাবীর সন

আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে এই পৃথিবীতে পাঠালেন ১২৫০ সনের হিজরী সনের ১৪ই শাওয়াল শুক্রবার মোতাবেক ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। তাঁর সাথে এক জময বোন (জান্নাত) জন্ম নিলেন। যেভাবে হাদীসে উল্লেখ ছিল হযরত ইমাম মাহ্‌দী জময জন্মগ্রহণ করবেন। আর তিনি (আ.) ১২৫১ হিজরী সনে প্রত্যাদিষ্ট রূপে ইলহাম প্রাপ্ত হন যখন তার বয়স ৪০ অতিক্রম হয়েছে। তারপরে ১৩০৬ হিজরী সনে মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো। এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

১২৯১ হিজরী সন মোতাবেক ১৮৮২ সনের ২৬ মার্চ প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার যে ইলহাম লাভ করেন তা হলো, 'কুল ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মু'মিনীন'। অর্থাৎ, তুমি বল আমি আল্লাহ্ কর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি এবং আমি বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম। (বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় খন্ড)

মুজাদ্দেদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৮৮৫ সনে একটি বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যাপকভাবে মুজাদ্দেদ হওয়ার দাবী প্রকাশ করে দিলেন। উর্দু এবং ইংরেজিতে ২০,০০০ কপি করে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার সমস্ত বড় বড় ধর্মীয় নেতা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানীগুণি ব্যক্তিবর্গের নিকট পৌঁছে দিলেন। ঐ যুগে এমন কোন প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি বাকী ছিলেন না যার কাছে এই সংবাদ পৌঁছানো হয় নি।

বিজ্ঞাপন প্রকাশ হলে ভক্তদের অনেকেই হুযূর (আ.)-এর কাছে বয়আত নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তাদের অনুরোধে তিনি (আ.) বলেন, 'আমার সমুদয় কর্মতৎপরতা মহান আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত। অতএব তাঁর নির্দেশ ছাড়া কিছুই করতে পারি না।'

১৮৮৫ সনের শেষ দিকে ও ১৮৮৬ সনের শুরুতে আল্লাহ্ তা'লার আদেশে হুশিয়ারপুরে ৪০ দিন ইবাদত বন্দেগী করেন এবং যার ফলশ্রুতিতে ইলহাম সমূহ লাভ করেন আর ঐ সময় সেই বিখ্যাত আল মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীও লাভ করেন। ইলহামের কথাগুলি ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়।

বয়আত নেয়ার কথা ঘোষণা

এ বছরের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ জুন ১৮৮৮ সনে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বয়আত নেয়ার ইলহাম প্রাপ্ত হন। এর কিছুদিন পর ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ সবুজ ইশতেহার প্রচারপত্রটির সাথে 'তবলীগ' শিরোনাম দিয়ে একটি টীকা সংযোজন করেন। এতে জনসাধারণকে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণের আহ্বান জানান। এই প্রচারপত্রে তিনি খোলাখুলি ঘোষনা করলেন, যারা সত্য অনুসন্ধানে আগ্রহী তাদেরকে দীক্ষা দানের জন্য তিনি আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন, যারা

প্রকৃতই নোংরা, অলসতা, অপবিত্র জীবন, পরিহার করতে আগ্রহী তাদের উচিত অবিলম্বে তার হাতে বয়আত করে সততার, বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা মজবুতী অর্জন করে ঈমানে দৃঢ়তা লাভ করা এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জনসাধারণকে তার সাথে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের আশ্বাস প্রদান করেন যে, তিনি তাদের বোঝা লাঘবে আন্তরিক সহযোগিতা দান করবেন এবং আল্লাহ্ তা'রা তার দোয়া কবুল করে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন তবে শর্ত হলো তার যেন সর্বান্তকরণে ঐশী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ মেনে জীবন অতিবাহিত করে। (সবুজ ইশতেহার, টীকা তবলীগ, ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮)

বয়আতের দশ শর্ত প্রকাশ

এ বছরের শেষে অর্থাৎ ১৮৮৯ সনের ১২ই জানুয়ারী, 'ইশতেহার তকমীলে তবলীগ' নামে বয়আতের দশটি শর্ত সম্বলিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন। সেই শর্ত মেনে আজও জামাতে আহমদীয়ায় বয়আত করতে হয়। শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক খোদা তা'লার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কৃদৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম (অত্যাচার) ও খেয়ানত (আত্মসাৎ), অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যেহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও নিয়মিত ইস্তেগফার পড়িবে, এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তা'রিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের উপরে সন্তুষ্টি থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসূলভ অবস্থার মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(ইশতেহার তকমীলে তবলীগ ঃ ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

লুধিয়ানায় উপস্থিত হওয়ার আহ্বান

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এটাও নির্দেশনা ছিল যে, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী ইস্তেখারা সম্পন্ন করার পর যেন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা বয়াতের জন্য উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আগে দোয়া করুন, ইস্তেখারা করুন অতঃপর বয়আত করুন। উপরোক্ত প্রচারপত্র পেশ করার পর হযরত আকদাস (আ.) কাদিয়ান থেকে লুধিয়ানায় গমন করেন ও 'মহল্লা জাদীদ'-এ হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করেন। (হায়াতে আহমদ, ৩য় খন্ড, প্রথম অংশ, পৃষ্ঠা-১)

বয়আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তিনি (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান করেই বয়আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আলোকপাত করে ৪ মার্চ ১৮৮৯ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, 'বয়আতের এই সিলসিলা বিশেষ ভাবে খোদাভীরুতায় অলঙ্কৃত ব্যক্তিদের জামাতকে সংঘবদ্ধকরার জন্য, যাতে খোদাভীরুতায় এমন এক বড় দল গঠিত হয়ে জগতে নিজেদের নেক প্রভাবের বিস্তার ঘটায় এবং তাদের একতা, ইসলামের জন্য কল্যাণকর, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশকারী শুভ পরিণামের কারণ হয়। এই কল্যাণমন্ডিত একত্ব প্রকাশক বাক্যের ওপর সমবেত হওয়াটা, ইসলামের পাকপবিত্র ও সম্মানপূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সেবায় দ্রুত সফলতা আনতে পারে, যাতে এক মুসলমানকে পীড়ত, নিষ্পেষিত, কৃপণ, পরাভূত ও পর্যদস্ত মুসলমানে পরিণত হতে না হয়। এরা সেরকম অর্বাচীন লোকদের মতও যেন না হয় যারা নিজেদের মত বিরোধিতা ও

অনৈক্যের কারণে ইসলামের বড় ক্ষতি সাধন করেছে। এর অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় কলঙ্কের কালিমাপূর্ণ দাগ এঁকে দিয়েছে। আবার এমন অকর্মন্য সাধু সন্নাসী বা নির্জনবাসী ঘরকুণোর মতও যেন না হয় যারা ইসলামের বর্তমান চাহিদাগুলো সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না যাদের নিজ আপনজনদের প্রতি সহমর্মীতার কোন বলাই নেই আর যাদের মানব সন্তানের কল্যাণ সাধনের কোন অনুপ্রেরণা বা স্পৃহাও নেই। পক্ষন্তরে এরা অর্থাৎ বয়আতকারীরা হলো এমন জাতি যারা গরীবের আশ্রয়স্থল, এতিমদের জন্য বাপের মত ও ইসলামের কাজে সহায়তা দিতে একান্ত প্রেমিকের মত আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত এবং যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা ও সাধ্য সাধনা এ উদ্দেশ্যে করে যেন এর সার্বজনীন কল্যাণ পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার লাভ করে। আর ঐশীপ্রেমে ও খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার পবিত্র প্রস্রবন ধারা প্রতিটি হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে এক স্থানে মিলে গিয়ে বহমান এক সমুদ্র স্রোতের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ..... খোদা তা'লাই এই দলকে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে স্বীয় শক্তি, ক্ষমতা ও মহিমা প্রদর্শন করতে সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর এদেরকে উন্নতি দান করতে চাচ্ছেন যাতে পৃথিবীতে মহব্বতে ইলাহী (পরম উপস্যের প্রতি ভালবাসা), তওবা নূসুহ (আন্তরিক অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে প্রত্যাবর্তন), পবিত্রতা প্রকৃত ও সঠিক পূণ্য কর্ম, শান্তি ও কল্যাণ এবং মানব সন্তানের জন্য মায়া মমতা সহমর্মিতা ছড়িয়ে দেয়া যায়। অতএব এই দল, তাঁর বিশেষ এক দলের মর্যাদা পাবে, তিনি তাদেরকে তাঁর নিজস্ব বিশেষ বাণী দ্বারা শক্তি ও ক্ষমতা যোগাবেন, তাদের নোংরামীপূর্ণ জীবন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিবেন। অতঃপর তাদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন দান করবেন। তিনি যেমনটি তাঁর নিজ ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই দলকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি দান করবেন এবং হাজার হাজার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদিদের এতে প্রবেশ করাবেন। তারা ঐ প্রদীপের মত যা ইসলামের কল্যাণ সাধনের জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শরূপে স্বীকৃত হবেন। তিনি এই সিলসিলার পূর্ণ অনুসারীদের প্রত্যেক প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে অন্য সিলসিলার অনুসারীদের ওপর বিজয় দান করবেন। সর্বদা কেয়ামতকাল পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে যাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে। ঐ রাব্বে জালিল-ই এটা চেয়েছেন, সর্বশক্তিমান, যা-ই তিনি চান করে থাকেন। প্রত্যেক শক্তি ও মহিমা তাঁরই। (তবলীগে রিসালত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫৫)

প্রথম বয়আত অনুষ্ঠান

ঐ একই বিজ্ঞাপনে তিনি (আ.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বয়আত গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ২৩ মার্চ লুধিয়ানায় উপস্থিত হবেন। পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মহল্লা জাদীদ-এ অবস্থিত সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়ীতে প্রথম বয়আত নেন। এ বয়আত অনুষ্ঠানে হুযূর (আ.) বয়আত নেয়ার জন্য একটি কক্ষে একেক জনকে আলাদা আলাদাভাবে ডাকতেন ও বয়আত নিতেন। এভাবে প্রথম বয়আত করেন হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.)। সেদিন চল্লিশ জন পুণ্যাত্মা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হস্তে বয়আত করেন।

সেদিনের বয়আত গ্রহণকারীরা হলেন হযরত মাওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.), হযরত হাফেজ হামেদ আলী (রা.), হযরত মুন্সি আব্দুল্লাহ্ সানোয়ারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। মার্চ মাস পুরোটাই হুযূর আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান করেন।

২৩ মার্চ ১৮৮৯ জামা'তের সূচনাকাল

এই ২৩ মার্চ ১৮৮৯ এর বয়আত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের গোড়াপত্তন হয় যা আজ শত শত বছর পরে সারা বিশ্বের ২০৯ টি দেশে আহমদীয়াতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। জামাতের সকলের কাছে এই দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই আমাদের এই দিবসকে স্মরণীয় করার জন্য নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশের আলোকে আমাদের খাঁটি মানুষ হিসেবে সর্বদা নেক আমলের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমলের ময়দানে আগে বাড়ার এবং প্রত্যেকের বয়আত কবুল করুন, আমীন।

[পুনর্মূদ্রিত]

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

(৩য় কিস্তি)

হুযূর (আই.) আরো বলেন যে, জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার প্রয়োজন ছিল সদস্য-দেশগুলোর মধ্যে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে। হুযূর (আই.) বলেন ঃ "কেবল বৃহৎ শক্তিগুলো এবং জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক কোন প্রতিষ্ঠান সর্বাবস্থায় যদি সত্যিকারে তাদের মূলনীতির ওপর কাজ করতো, তবে আমরা সন্ত্রাসবাদের এই বিষময় প্লেগকে বিশ্বের এতগুলো অংশে সংক্রমিত হতে দেখতাম না। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাকেও আমরা বারবার ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হতে দেখতাম না, আর বিপুল উদ্বাস্তু-সংকট, যেটা বর্তমানে ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশগুলোকে বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত করছে, সেটাকেও আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হতো না।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে জাতিসংঘকে অবশ্যই কুটীল রাজনীতি, অবিচার এবং স্বজন-প্রীতির ভারমুক্ত হয়ে এর আসল-ভূমিকাটি পালন করতে হবে।"

উপসংহারে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন : "আমি আশা করি এবং দোয়া করি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ জাতিসংঘকে এবং বিশ্বের সরকারগুলোকে এমন ভাবে কাজ করার তৌফিক দিন, যাতে সত্যিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কোন বিকল্প চিন্তা করা যায় না, কারণ এখন আমরা যেভাবে চলছি, সেভাবে চলতে থাকলে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের আকারে বিপুল এক ধ্বংসের দিকে বিশ্ব অতি দ্রুত ধাবিত হবে।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ " বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও নীতি নির্ধারকগণকে আল্লাহ্ জ্ঞান দান করুন, যাতে যে-বিশ্বকে আমাদের সন্তানদের ও ভবিষ্যত-প্রজন্মের জন্যে রেখে যাচ্ছি, সেটা যেন শান্তি ও সমৃদ্ধির এক বিশ্ব হয়।"

এ অনুষ্ঠানটি চলাকালে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) জাতিসংঘের মানবাধিকার বিভাগের সাবেক হাই কমিশনার এবং কানডীয় সুপ্রিম কোর্টের সাবেক জজ মিসেস লুইস আর্বারকে জন সেবার জন্যে স্যার জাফরুল্লাহ্ খান পুরস্কারে ভূষিত করেন। তার সুদীর্ঘ ও স্বতন্ত্র জীবন-ধারার জনসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে এ পরস্কারটি প্রদান করা হয়। পুরস্কারটি গ্রহণের পর মিসেস লুইজ আর্বার বলেন ঃ "মহান একজন আইনজ্ঞ, আইনজীবি, বিচারক এবং স্বনামধন্য এক কূটনীতিবিদের নামাঙ্কিত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কারটি পেয়ে আমি নিজেকে বিশেষ-ভাবে সম্মানিত বোধ করছি। স্যার চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান যখন আন্তর্জাতিক আদালতে চীফ জজ ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন তার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করে আমি নিজেকে বিশেষভাবে সম্মানিত বোধ করি। শান্তির সংস্কৃতিকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত যেভাবে উৎসাহিত করে থাকে এবং করে চলছে, তাতে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি।"

বেশ ক'জন অতিথি-বক্তাও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। বিজ্ঞান-মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী জাষ্টিন ট্রুডো-র দাপ্তরিক প্রতিনিধি মিঃ কার্ষ্টি ডানকান বলেন ঃ "আজ রাতে এখানে উপস্থিত থেকে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-কে পার্লামেন্ট হিল-এ স্বাগত জানানোর সুযোগ লাভ করে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে পার্লামেন্ট-হিলের সবাই আজ একত্রিত হয়ে তার সাথে মিলিত হতে পেরে এবং তাকে আমাদের জোরালো-সমর্থন জ্ঞাপন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। কানাডায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশাল এক পার্থক্য সৃষ্ট করেছে এবং সর্বদাই 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে'–এর অনুশীলন করে যাচ্ছে।"

আন্তর্জাতিক ধর্মীয়-স্বাধীনতা বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের কমিশন-এর ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ জেমস জে জগ্‌বি বলেন ঃ "আন্তর্জাতিক ধর্মীয়-স্বাধীনতার ওপর ইউ. এস. কমিশনের পক্ষ থেকে আমি আজ রাতে হুযূর (আই.) এর পাশে থাকতে পেরে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে যে বিষয়টি সর্বদাই আমাদেরকে

গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তা হচ্ছে– এ জামাতের সবাই প্রায়শঃই নির্যাতনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও আপনারা নির্যাতিত অন্যান্যদের অধিকারকে সর্বদাই সমর্থন দিয়ে আসছেন। এমন এক বিশ্ব, যেখানে অসহিষ্ণুতা ক্রমেই বেড়ে চলছে, সেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সহিষ্ণুতা ও মঙ্গল-কামনায় এক শক্তিশালী প্রবক্তার ভূমিকা পালন করে চলছে।"

দিনের শুরুতে হুযূর (আই.) কানাডা সরকারের ফেডারেল মন্ত্রীবর্গ, সিনেটরবৃন্দ ও এম. পি. গণের সাথে বেশ কয়েক দফা সভায় মিলিত হন। এ ছাড়াও, হুযূর (আই.) প্রধানমন্ত্রী মি. জাষ্টিন ট্রুডোর সাথেও এক সাক্ষাতকারে মিলিত হন। প্রশ্নোত্তরের এক পর্বে হুযূর (আই.) আইন-সভার স্পিকার কর্তৃক দাপ্তরিকভাবে সবার সাথে পরিচিত হন, যেখানে প্রধানমন্ত্রীসহ হাউজ অব কমন্‌স এর উপস্থিত সব সদস্য দাঁড়িয়ে গিয়ে হুযূর (আই.)-কে সম্মান প্রদর্শণ করেন। উপরন্তু, এম.পি. মিঃ জুডি এসগ্রো হাউজ অব কমন্‌স-এ একটি সদস্য-বিবৃতি পড়ে শোনান, যাতে স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, " আজ পূর্বাহ্নে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতা পার্লামেন্ট হিলে আনুষ্ঠানিক এক সফরে অটোয়া পৌঁছেছেন। এ সফরে আমাদের সাথে অবস্থানকালে 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে'– এই শান্তিপূর্ণ বাণীটিকে অধিকতর বিস্তার দানের প্রচেষ্টায় তিনি কেবিনেট মন্ত্রীবর্গ, সিনেটর বৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করবেন। এ কাজটি হচ্ছে চলমান প্রচেষ্টার এক অংশ, যেটা তিনি ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি ও সৌন্দর্য প্রকাশের কর্মসূচী হিসেবে হাতে নিয়েছেন এবং বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোকে শান্তি ও ধর্মীয়-স্বাধীনতা কায়েমের এবং কানাডা ও বিশ্বের অন্যান্য দেশকে মানবাধিকার উন্নয়নের আহ্বান জানাচ্ছেন। হুযূর (আই.) ও বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে তাদের এ কাজের জন্যে আমি অকুণ্ঠ-সমর্থন জ্ঞাপন করছি, এবং আমার সংসদ সদস্যবৃন্দ ও কানাডার জনগণের পক্ষ থেকে আমি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করছি।"

বিশেষ এ সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানটি হুযূর (আই.) কর্তৃক পরিচালিত এক নীরব দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়। নৈশভোজের পর আইন-সভার সদস্য ও অতিথিবৃন্দ হুযূর (আই.)-এর সাথে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাত করার সুযোগ লাভ করেন।

২১ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার অন্টারিওর পিস-ভিলেজে অবস্থিত বায়তুল ইসলাম মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। খুতবায় হুযূর (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যে দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনির ওপর আলোকপাত করেন, তারা হচ্ছেন ইমাম বশির রফিক খান ও ডাঃ নুসরাত জাহান। এরা উভয়েই এদের সারা জীবন ধর্ম ও মানবতার সেবায় কাটানোর পর ১১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ইংল্যান্ডে ইন্তেকাল করেন।

খুতবা শুরু করার পর হুযূর (আই.) বলেন, "এ পৃথিবীতে আগত সবাইকেই একদিন না একদিন চলে যেতে হবে। যাহোক, সৌভাগ্যশালী হচ্ছে তারা, খোদা যাদেরকে তাদের ধর্ম ও মানবতার সেবা করার তৌফিক দান করেন।"

ইমাম বশির রফিক খান সাহেবের জীবনের বহুবিধ কর্মগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–তিনি বেশ ক'বছর যাবত লন্ডনে নির্মিত প্রথম মসজিদ 'ফজল মস্ক'-এর ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন উপায়ে তিনি ইসলামের খাঁটি শিক্ষাগুলো প্রসারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন এবং 'দি মুসলিম হেরাল্ড'-নামক ইংরেজী ম্যাগাজিনটি আরম্ভ করেন। হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন, ইমাম বশির রফিক খান অত্যধিক পরিশ্রমের সাথে ধর্মের সেবা করেন এবং ইবাদতে তার বিপুল আস্থা ছিল এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্যে সর্বদা তার সন্তানদেরকে উপদেশ দিতেন।

ডাঃ নুসরাত জাহান-এর সেবাগুলোর উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন যে, পাকিস্তানে তিনি ছিলেন খ্যাতিসম্পন্ন একজন স্ত্রীরোগ-চিকিৎসক, যিনি ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ধর্ম ও মানবতার সেবায় তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং পাকিস্তানের রাবওয়াস্থ ফযলে ওমর হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। হুযূর (আই.) বলেন, নিঃস্বার্থভাবে এবং সহানুভূতির সাথে তিনি তার রোগীদের সেবা করতেন, আর যে বিশাল-সংখ্যক লোকদের চিকিৎসা তিনি করে গেছেন, তারা তার কাছে চির-ঋণী থাকবে। হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন যে, কিছুদিন তিনি যুক্তরাজ্যে পড়ালেখা ও কাজ করেছেন এবং পর্দা পালনের বিষয়ে তিনি কখনো কোন আপোষ করেন নি। হুযূর (আই.) বলেন, "ডাঃ নুসরাত জাহান কখনোই কোন হীনমন্যতায় ভুগতেন না। পর্দাপ্রথা পূর্ণভাবে পালন করেও অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে তিনি তার পেশাগত সার্বিক-দায়িত্ব পালন করতেন। সে কারণে যেসব মহিলা বলে যে, পর্দা পালন করে তারা কাজ করতে পারে না, সেসব মহিলার জন্যে তিনি হচ্ছেন এক আদর্শ নমুনা।" তার ধার্মিকতা ও দয়াপূর্ণ আচরণে প্রভাবিত লোকেরা তার সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক যেসব কথা বলে গেছেন, হুযূর (আই.) সেগুলোর উল্লেখ করেন।

উপসংহারে হুযূর (আই.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা এ মরহুমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং ফযলে ওমর হাসপাতালকে আল্লাহ্ তার মত অনেক চিকিৎসক দান করুন, যারা বিশ্বস্ততার সাথে চিকিৎসা-সেবাদানে তাদের দায়িত্বাবলী পালন করবেন।" খুতবা শেষে হুযূর (আই.) আবেগঘন একটি বয়আতের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, যেখানে প্রথমবারের মত বহুলোক হুযূর (আই.)-এর হাতে বয়আত করেন।

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর– ৬২)

দ্বিতীয়তঃ ইহুদী পন্ডিতগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কিত তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইস্রায়েল বংশ থেকে সেই মহানবীর আবির্ভাবের অপেক্ষা করছে (দ্বিতীয় বিবরণঃ ১৮:১৮ এবং ৩৩:২)। তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত মহানবী বনী ইস্রায়েলীর অপর ভ্রাতৃদের মধ্যে অর্থাৎ বনী ইসমাঈল থেকে আগমনের ব্যাখ্যা মানতে তারা রাজী হয় নি। ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য ঐশী সাহায্য এবং উন্মুক্ত চিন্তা-চেতনার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয়তঃ 'দশ হাজার পবিত্র আত্মাসহ' সেই মহানবীর আগমন সংক্রান্ত তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হয় নি (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:২)। ইহুদীদের এই দাবীর উত্তরে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মক্কা-বিজয়ের সময় দশ হাজার সাহাবীসহ বিজয়ী-বেশে মক্কায় প্রবেশের সত্যতা উপস্থাপন করেন। কিন্তু ইহুদী-খৃষ্টানগণ অদ্যবধি তাদের কল্পিত আক্ষরিক ব্যাখ্যাসহ সেই মহানবীর আগমনের জন্য অপেক্ষমান।

মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কিত আরও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে (যিশাইয় ২১:১৩-১৭,পরমগীত ১:৫-৬ , হবক্কুক ৩:৭)। সেগুলোর মর্মার্থ গ্রহণ না করার ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) রূপকাবৃত ভবিষ্যদ্বাণী এবং খৃষ্টানগণের বিভ্রান্তির কারণ :

মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে খৃষ্টানগণ অদ্যবধি এই কারণে মান্য করে নি যে, তাদের ব্যাখ্যানুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণতা লাভ করে নি। যেমন বাইবেলের নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বানীগুলো দ্রষ্টব্যঃ

(১) বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী (যোহন, ১৪:১৬-১৭) অনুযায়ী মহানবী (সা.)-কে 'প্যারাক্লিত' বা Comforter বা Spirit of Truth নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(২) 'দামাসকাস ডকুমেন্ট' নামক ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সা.)-কে "এমদ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৩) বাইবেলের ভবিষ্যদ্বানী "সেই পবিত্র আত্মা... তিনি সকল বিষয় তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন" বিধানসহ মহানবী (সা.) আগমন করেছেন।

(৪) যোহন ১৪:২৯-৩১ "জগতের অধিপতির শান্তিবার্তা অনুযায়ী শান্তির ধর্ম তথা 'ইসলাম' ধর্ম প্রবর্তক মুহাম্মদ (সা.)-কে খৃষ্টানগণ আজও গ্রহণ করেন নি।

(৫) যোহন, ১৪:১২-১৪ যীশু বলেছেন; "তোমাদিগকে বলিবার আরও অনেক কথা আছে... কিন্তু তোমরা এখন সে সকল কথা সহ্য করিতে পারিবে না। সেই সত্যের আত্মা যখন আসিবেন তখন তিনি পথ দেখাইয়া সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি নিজ হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন...।" এই সকল বিষয় মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে এবং পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে... এই ব্যাখ্যা খৃষ্টানগণ মানতে পারছেন না।

যীশুখৃষ্ট সংক্রান্ত অনেকগুলো বিশ্বাস খৃষ্টানগণ কালক্রমে এমনভাবে বিকৃত করেছে, যা খুবই দুঃখজনক। বিশেষত: ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের ধ্যান-ধারণা পৃথিবীব্যাপী মারাত্মক ধর্মীয়-বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

বর্তমান খৃষ্টানদের মতে ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্র যীশু এবং পবিত্র আত্মা... এই তিন প্রকার ঈশ্বরত্বের মতবাদ, অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ প্রচলিত রয়েছে। তাদের মতে আদম-হাওয়ার দ্বারা সংঘটিত আদি-পাপের কারণে মানুষ জন্মগতভাবে পাপী, তাই ঈশ্বর তার পুত্রের মাধ্যমে সেই আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এবং যে-কেউ যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করবে, সে পাপ-মুক্ত হবে এবং 'নাজাত' (পরিত্রাণ) লাভ করবে। পাপী-তাপী, অপরাধী, সকলের জন্য নাজাত (পরিত্রাণ) লাভের এত বড় সুযোগ খুবই লোভনীয় বটে। পবিত্র কুরআন এরূপ ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসকে মারাত্মক অপ–প্রচার, এবং অপ-ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেঃ "এবং তারা বলে, রহমান আল্লাহ পুত্র গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা এক অতি

গুরুতর মিথ্যা-কথা বলছো। আকাশ সমূহ ফেটে যাওয়ার এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার এবং পর্বতমালা খন্ড-বিখন্ড হয়ে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ তারা আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র আরোপ করেছে। (সূরা মরিয়ম:৮৯-৯১)।

(ঘ) পবিত্র কুরআনের আলোকে রূপক বর্ণনা :

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৮ নং (৩:৮) আয়াতে দুরকম বর্ণনা-রীতির উল্লেখ রয়েছে: "তিনিই তোমার উপর এই কিতাব নাযিল করিয়াছেন যাহার কতগুলি 'আয়াতুম মুহকামাত' (অর্থাৎ দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত) যেগুলি এই কিতাবের মূল এবং অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ্‌ আয়াত' (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ন রূপক এবং ব্যাখ্যামূলক আয়াত)। কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে তাহারা ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরন করে যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ন রূপক অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ এবং জ্ঞানে পরিপক্ক লোকগন যাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত'। বস্তুতঃ ধীমান চিন্তাশীল ব্যক্তিগন ব্যতীত অন্য কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না"। উপরোক্ত আয়াতে পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহের দু'রকম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

(ক) 'মুহকাম আয়াত' দ্বারা দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট অর্থ-বিশিষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা বহনকারী আয়াতের কথা বলা হয়েছে (মুফরাদাত এবং লেইন)। এগুলো হলো উম্মুল কিতাব অর্থাৎ কুরআনের ভিত্তিমূলক আয়াত।

(খ) 'মুতাশাবিহ্‌ আয়াত' দ্বারা বাক্য বা বাক্যাংশকে বুঝায় যার বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করা যায় এবং ঐ বিভিন্নতার মাঝেও মুহকাম আয়াতের সঙ্গে এর একটি ঐক্য এবং সাদৃশ্যপূর্ন সম্পর্ক থাকে।

'মুতাশাবিহ্‌ আয়াতের অন্তর্নিহিত দ্ব্যর্থবোধক এবং ব্যাখ্যামূলক বিষয়াবলি মীমাংসার জন্য কতগুলো সুবর্ন নীতিমালা রয়েছে–

১–সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যাটিকে কুরআনের সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন আয়াত সমূহের আলোকে পরীক্ষা ও বিবেচনা করতে হবে।

২–এমন কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে না যা 'মুহকাম' আয়াতের সঙ্গে খাপ খায় না বা বিরোধী হয়।

৩–মুতাশাবিহ্‌ আয়াতের প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'লা সম্যকভাবে জানেন এবং যারা ঐশী সাহায্য–প্রাপ্ত পরিপক জ্ঞানী তারা তা বুঝতে পারেন। যেভাবে আল্লাহ্‌ তা'লা সূরা আল ওয়াকিয়া: ৮০নং আয়াতে বলেছেন: "লা–ইয়ামাস–সুহু–ইল্লাল মুতাহ–হারুন" অর্থ–'পবিত্রলোকগণ ব্যতীত কেহ ইহাকে অর্থাৎ কুরআনকে স্পর্শ করিবে না। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তি যারা ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণ করত: জীবন–যাপন করার মাধ্যমে হৃদয়ে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করেন, তারাই কুরআনের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং রহস্যাবৃত ঐশী জ্ঞান–ভান্ডারে প্রবেশ লাভ করেন।

৪–'উলুল আলবাব' অর্থাৎ বুদ্ধি–দীপ্ত ধীমান ব্যক্তিগণ যারা উন্মুক্ত হৃদয়ে জ্ঞান–চর্চা করেন শুধু তারাই পবিত্র কুরআনের ঐশী জ্ঞান–ভান্ডারে প্রবেশ করতে সক্ষম।

৫–সমগ্র কুরআনই এক হিসেবে 'মুহকাম' (সূরা হুদ ১১:২) অর্থাৎ মজবুত এবং সুস্পষ্ট অর্থপূর্ণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইহা একই সময়ে 'মুতাশাবিহ্‌' (সুরা যুমার ৩৯:২৪)। অর্থাৎ পরস্পর সামঞ্জস্য–পূর্ণ এবং নির্ভরশীল অর্থের মাধ্যমে আয়াতসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

৬–'মুহকামাত' সাধারণতঃ আইনের এবং ঈমান বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিধিমালা বর্ণনা করে। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহাত বিষয়াবলীতে সাধারণতঃ নবীগণের জীবন–কাহিনী, জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষ বাগধারা এবং প্রকাশভঙ্গী ব্যবহৃত হয়, যা ব্যাখ্যা করতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত রীতি হল মুহকাম আয়াতের স্পষ্ট শিক্ষার বিরোধী কোন অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭–ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে উভয় প্রকার পদ্ধতি অর্থাৎ সুস্পষ্ট এবং সরাসরি বর্ণনা রীতি গ্রহণ করা হয়েছে আবার আলঙ্কারিক ও রূপক ভাষাও বর্ণিত রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক এমন অর্থ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যা মুহকাম আয়াতের কোন মৌলিক নীতিমালার বিপক্ষে বা সাংঘর্ষিক না হয়।

৮–'মুতাশাবিহ্‌' বা রূপক এবং আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার দ্বারা অর্থের ব্যাপকতা এবং গভীরতা অল্প কথায় অনেক বিষয়ে প্রকাশ করা সহজতর হয়। মূলতঃ আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহারে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য, ধর্মীয় শাস্ত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং সুশিক্ষিত মহল এরূপ বর্ণনারীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

৯–প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য এই সকল রূপকাবৃত বিষয়গুলোর মাধ্যমে এক ধরণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভবপর হয়।

১০–ধর্মীয় সকল বিষয় বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ সরাসরি বর্ণনা করা হলে ঈমানের পরীক্ষা ছাড়াও বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটনা প্রবাহ স্বাভাবিক ভাবে নিজস্ব গতিতে পরিপক্কতা অর্জন করতে পারে না। যেমন কোন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির আগমন সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা অমুক স্থানে, অমুক তারিখে এবং অমুক গৃহে সংঘটিত হবে ইত্যাদি সহজ সরল ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হলে, সেই আগমনকারীর জন্মগ্রহণ, বাল্যকালে জীবন–যাপন ইত্যাদি স্বাভাবিক বিষয়গুলো যেমন কঠিন হবে, তেমনি কেউ কেউ হিংসা–বিদ্বেষের কারণে বাল্যকালেই সেই আগমনকারীর জীবনাবসান ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে।

[চলবে]

শরীয়ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী

খন্দকার আজমল হক

২০১৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বগুড়ায় একটি জামাতি অনুষ্ঠান চলছে। অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছিল জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম রাজিবউদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধানে। অনুষ্ঠানের এক পার্শ্বে এক নাসেরাত 'ওয়াজিব', 'ওয়াজিব' বলছিল। আমি তাকে ওয়াজিব কি জিজ্ঞাসা করলে সে তা বলতে পারল না। আমি তাকে ফরয ও সুন্নত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে তাও বলতে পারল না। যখন তাকে বিষয়গুলো বোঝাতে চেষ্টা করলাম তখন তার ভেতর অস্থিরতা দেখা গেল। অর্থাৎ সে বিষয়গুলো জানতে অনাগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম থেকে উঠে চিন্তা করলাম, এমন স্বপ্ন দেখার কারণ কী? হঠাৎ আমার মনে হলো হয়তো এ সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নয়। তাই তাদের বিষয়গুলো জানাবার জন্য এটা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটা ইশারা। আমি ভাবলাম, এগুলো যে শরীয়ত সম্পর্কিত তা তাদের জানানো প্রয়োজন। শরীয়ত কী এবং কেন তা কেউ নাও জানতে পারে। এজন্য শরীয়ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিয়ে লেখার ইচ্ছে জাগল। তাই আমার এ প্রয়াস।

শরীয়ত ইসলামের ধর্মীয় বিধান বা আইন-কানুন। এর মূল বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কুরআনে বর্ণিত আছে। কুরআনে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এমন কিছু ইবাদত, যা রসূলে করীম (সা.) পালন করেছেন, শরীয়তের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া কুরআনের কিছু আদেশ বাস্তবায়নকালে হুযূর পাক (সা.) যেসব কাজ করেছেন সেগুলোকেও শরীয়তের অংশ হিসেবে ধরা হয়। এগুলো রসূলে পাক (সা.)-এর সুন্নাহ হতে এসেছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

কুরআনে বর্ণিত নির্দেশসমূহকে ফরয বলা হয়। এছাড়া কুরআনের কিছু নির্দেশ বাস্তবায়নকালে যেসব কাজ করা হয় তার ভেতরও ফরয আছে। এ নিয়েও পরে আলোচনা করা হয়েছে।

রসূলে পাক (সা.)-এর সুন্নাহ হতে প্রাপ্ত ইবাদত ও কার্যাবলীকে ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল এই কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারেও পরে আলোচনা করা হয়েছে।

জাগতিক জীবনে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় বিধান বা আইন কানুন থাকে। যাকে "কন্সটিটিউশন" বা শাসনতন্ত্র বলে। রাষ্ট্রের প্রজাদের এসব বিধিবিধান মেনে চলতে হয়। অন্যথায় রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এজন্য আইন অমান্যকারীকে রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তি পেতে হয়। এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেয়ারও বিধান আছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর শাসনকর্তা (৩:১৯০)। আরও বলেছেন যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর (২০:৭) অর্থাৎ তিনি এদের মালিক। অতএব তাঁর এই রাজ্য ও বাসিন্দাদের পরিচালনার জন্য একটি বিধান বা শাসনতন্ত্র প্রয়োজন। কুরআনই সেই বিধান বা শাসনতন্ত্র যাকে আল্লাহ্ শরীয়ত বলেছেন। তাঁর সৃষ্টির সবকিছুই সেই শরীয়ত বা বিধান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সৃষ্টির সব সৃষ্ট বস্তুই তাদের জন্য নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী চলছে, মানব ব্যতীত। অন্যান্য বস্তু তাদের নির্ধারিত বিধান মেনে চলায় আল্লাহ্‌র রাজত্ব সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। আল্লাহ্ বলেন, "যিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, তুমি কি কোন ত্রুটি পাও? অতঃপর তুমি পুন:পুন: দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে তোমার নিকট ফিরে আসবে, এমতাবস্থায় যে শ্রান্তক্লান্ত হবে, তবুও কোনো প্রকার অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না" (৬৭:৪-৫)।

মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অংশ হওয়ায় তাদের জন্যও কুরআনরূপ শরীয়ত পাঠানো হয়েছে এবং তা মান্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, না মানলে ইহকালে ও পরকালে শাস্তি পেতে হবে।

যুগে যুগে নবীদের মাধ্যমে কুরআনের ন্যায় কিতাব দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বিধান পাঠিয়েছিলেন ও তদানুযায়ী চলার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু নির্বোধ মানুষ

আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করায় ইহকালেই তাদের শাস্তি প্রদান করা হয়। এমনকি অনেক জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। লুতের জাতি, আদ ও সামুদ জাতি এ-ও উদাহরণ।

শরীয়ত সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে "আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত (বিধান)-এবং (স্পষ্ট) কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করেছি" (৫:৪৯)। এ-ও বলেছেন, "অতঃপর আমরা তোমাকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে এক মহান শরীয়তের (বিধানের) উপর অধিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি এর অনুসরণ কর এবং ঐসব লোকের অনুসরণ করোনা যাদের কোনো জ্ঞান নেই" (৪৫:১৯)।

উপরে উদ্ধৃত প্রথম আয়াতে আরবী "শিরআহ (শরীয়ত)" ও "মিনহাজ (কার্যপদ্ধতি)" শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ টীকাতে বলা হয়েছে, "শিরআহ্‌ বলতে আল্লাহ্‌র বিধানের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ধর্ম-কর্ম সম্পর্কিত অধ্যাদেশগুলো বোঝাচ্ছে। বিশ্বাস ও আচরণের প্রকাশ্য ও সত্যপথ। (লেইন) আল মুবাররাদ বলেন, "প্রথমোক্ত শব্দটি রাস্তাটির প্রারম্ভ বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দটি চলন অধ্যুষিত রাস্তাটিকে বুঝায় (কাসির)। অতএব "শিরআহ" ঐসব আইনকে বুঝায় যেগুলো আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত এবং "মিনহাজ" জাগতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত। (কুরআন মজিদ- টিকা-৭৫৩)।

জাগতিক বিষয়াবলী বলতে সৃষ্টিতত্ত্ব, মানব জীবন পরিচালিত বিষয়সমূহ ইত্যাদি বুঝায়।

উপরের উদ্ধৃতি ছাড়াও কুরআনের অনুশাসন মেনে চলার নির্দেশ কুরআনের অনেক স্থানেই আছে (দেখুন- ৬:৫১; ১০:১১০; ইত্যাদি)।

এবার রসূলে পাক (সা.)-এ-ও সুন্নাহ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তিনি যেসকল কাজ করেছেন সেগুলোকেই সুন্নাহ বলে। শরীয়তের অনেক বিষয় এই সুন্নাহ থেকে এসেছে যা কুরআনে নেই, এর মধ্যে কিছু বিষয় অবশ্যপালনীয়। যার মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি আছে। ওয়াজিবের মধ্যে এশার নামাযের পর ৩ রাকাত বিতর ও দুই ঈদের নামায। এছাড়াও নামায পড়ার সময় যেসব কাজ করা হয় তাও হুযূর পাক (সা.)-এর সুন্নাহ থেকে এসেছে। কুরআনে নামাযের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু নামায কত প্রকার, প্রতি ওয়াক্তে কত রাকাত নামায, নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদাহ, বৈঠক এসব সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। রসূলে করিম (সা.) নিজে করে এসব নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়েছেন। কিভাবে ওযু করতে হয় তাও করে দেখিয়েছেন। এগুলোই সুন্নাহ।

সাহাবী, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনদের বংশ পরম্পরায় এগুলো চলে আসছে। এছাড়া হাদীস শরীফ হতেও সুন্নাহর অনেক বিষয় জানা যায়।

এখন শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ফরয। ফরয শরীয়তের সেই সকল বিষয় যা অবশ্যপালনীয়। এগুলো করলে সওয়াব, না করলে গুনাহ। এর মূল বিষয়গুলি কুরআনের বর্ণিত আছে যা আল্লাহ্‌র আদেশ। যেমন: নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। এছাড়া আরও কিছু বিষয় আছে যাকে ফরয বলা হয় কিন্তু কুরআনে নেই। যেমন: নামায পড়ার সময় যেসকল কাজ করা হয় তার মধ্যেও ফরয আছে। উদাহরণস্বরূপ নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদাহ ইত্যাদি। (দেখুন- 'সালাত' পুস্তিকা, পৃ: ৫৮-৬১)। বিভিন্ন ওয়াক্তে সুন্নত ও নফলের ন্যায় ফরয নামাযও পড়া হয়। যেরূপ ফজরের দু'রাকাত, জোহরের চার রাকাত, আসরের চার রাকাআত, মাগরিবের তিন রাকাত এবং এশার নামাযে চার রাকাত।

কুরআনে বর্ণিত ফরযের সংখ্যা কত এ সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কেউ কেউ বলেন কুরআনে একশত তিরিশ ফরয আছে। এজন্য বলা হয় একশত তিরিশ ফরয। তবে এ যুগের হাকামান মুকামান আদালান হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর 'কিশতিয়ে নূহ" পুস্তকে কুরআন পাকের সাতশত আদেশ নিষেধের উল্লেখ করেছেন।

অনেকে কুরআনের বিশেষ কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু আরও যেসব আদেশ আছে তার প্রতি তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কুরআনের সব আদেশকেই অবশ্যপালনীয় বলেছেন (কিশতিয়ে নূহ)। তাই এসব আদেশ নিষেধ জানা প্রয়োজন। সেজন্য অর্থসহ কুরআন বেশী বেশী পাঠ করতে হবে। আমার লেখা "কুরআন ও জীবন" গ্রন্থে ফরয বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটিও পাঠ করতে পারেন। পুস্তকটি জামাতের ৪নং বকশীবাজারস্থ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যেতে পারে।

এ প্রবন্ধটিতে সব ফরয নিয়ে আলোচনা না করে অন্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যার উপরে খুব কমই গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন: কুরআন পাঠ, মালী কুরবানী, যিকরে ইলাহী ও মিথ্যা বলা।

কুরআন পাঠ: আল্লাহ্‌ তা'লা কুরআনের অনেক স্থানে কুরআন পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, "প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্‌র নিকট) নিশ্চয়ই গ্রহণীয়" (১৭:৭৯)। অন্যত্র বলেছেন, "যাদেরকে আমরা কিতাব (আল কুরআন) দান করেছি, তারা যথাযথভাবে তা আবৃত্তি ও অনুসরণ করে। তারাই তার উপর প্রকৃত ঈমান রাখে। যারা একে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে" (২:১২২)।

হযরত রসূলে করীম (স:) ও তাঁর উম্মতদের কুরআন পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে এসেছে, "হযরত আবু উম্মাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূরুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কুরআন পাঠ কর, কেননা বিচার দিবসে এ তার (পাঠকের) শাফায়াতকারী হবে" (মুসলিম)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ও কুরআন পাঠের তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"এখন সকল পুস্তক বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন পাক) পাঠ কর। বড়ই বেঈমান সেই ব্যক্তি যে কুরআন করীমের দিকে দৃষ্টি নিবেশ করে না। শুধু অপরাপর গ্রন্থ ও পুস্তকাবলীর উপরই বেশী ঝুঁকে থাকে" (আল হাকাম-চতুর্থ খন্ড, ১৭ই অক্টোবর, ১৯০০ সাল)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছেন যে, সকল আহমদীদের বাড়ি হতে যেন প্রতি প্রভাতে কুরআন পাঠের আওয়াজ শোনা যায়।

মালী কুরবানী: কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে মালী কুরবানী বা আল্লাহ্‌র পথে খরচের তাগিদ এসেছে। একস্থানে বলা হয়েছে, "হে যারা ঈমান এনেছ! আমরা তোমাদেরকে যে রিযক দান করেছি, তা থেকে খরচ কর সেই দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব এবং শাফায়েত (সুপারিশ) চলবে না। বস্তুত কাফেররাই যালেম" (২:২৫৫)।

লক্ষ্য করুন, বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে খরচ, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করেনা তারা কাফের। আর কাফেররা জাহান্নামি। এটা আল্লাহ্‌র কথা।

সূরা বাকারার প্রথমেই বলা হয়েছে যে, যারা নিজ রুজি হতে খরচ করে তারা মুত্তাকী। আর মুত্তাকী না হলে কুরআন হতে হেদায়েত পাওয়া যায়না।

আল্লাহ্‌র পথে খরচে কার্পণ্য নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরাই সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। তবে তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যে কার্পণ্য করে। কিন্তু যে কার্পণ্য করে সে নিজের জন্যই কার্পণ্য করে" (৪৭:৪৯)।

রুজি হতে খরচ শুধু নিজের বা পরিবার পরিজনের জন্য করলেই চলবেনা, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় পরকালের খোরাকের জন্যও করতে হবে। কুরআন পাক বলে, "এবং আল্লাহ্ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তুমি তা দ্বারা পরকালের বাসগৃহের অনুসন্ধান কর এবং তোমাদের পার্থিব জীবনের অংশকেও ভুলো না"। (২৮:৭৮)

এ খরচ দুভাবে করার কথা আল্লাহ্ বলেছেন। যাকাত, সদকা ছাড়াও সূরা বাকারার ১৭৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "এবং যে তাঁরই প্রেমে আত্মিয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীদের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন সম্পদ খরচ করে"।

আর এক প্রকার খরচ যা ইসলাম প্রচারের জন্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বলা হয়েছে। সূরা সাফের ১০, ১১, ১২ নং আয়াত সমূহে এ সম্পর্কে নির্দেশ এসেছে। ১০ নং আয়াতে ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বানী করার পর বলা হয়েছে, "হে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সংবাদ দেব যা তোমাদের কে কঠোর আযাব হতে রক্ষা করবে?" "(তা এই যে) তোএ-ওা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ"। (৬১:১১, ১২)

জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের কথা কুরআন পাকের আরও কয়েক স্থানে উল্লেখ আছে? এসব আয়াতে নিজেদের মাল এমনকি জীবন কুরবানী করতে হলেও ইসলাম প্রচারের জন্য তা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কুরআনের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারও এক প্রকার জিহাদ, বরং জিহাদে কবীর।

হযরত রসূলে পাক (সা.)-এর জামানায় যখন জিহাদের ডাক আসত, তখন সবাই জিহাদে যাবার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। কেউ কেউ কোন কারণ বসত না যেতে পারায় মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতেন। তারা শুধু জান দিবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন না মালের কুরবানীতেও অগ্রগামী থাকতেন। তাবুকের যুদ্ধের সময় অর্থের কুরবানীর আহ্বান আসলে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.) সবাই আর্থিক কুরবানী করতে এগিয়ে এসেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তো তাঁর সকল সম্পদ হুযূর পাক (সা.)-এর সামনে পেশ করেছিলেন। যখন তাঁকে বলা হয়েছিল, তিনি তাঁর পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই তাঁদের জন্য যথেষ্ট। ত্যাগের কি আদর্শ!

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তো ইসলাম প্রচারের জন্য প্রত্যেক উপার্জনক্ষম আহমদীর উপর তাদের আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ চাঁদা হিসেবে ধার্য্য করে যান। খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) নিয়মিত চাঁদা ছাড়াও তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ প্রবর্তন করে মালী কুরবানীর ব্যবস্থা প্রশস্ত করেন। তিনি মোবাল্লেগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন যারা প্রাণ বাজি রেখে ইসলাম প্রচার রুপ জিহাদে অংশগ্রহণ করছেন।

যিকরে ইলাহী: যিকরে ইলাহী বা আল্লাহ্‌কে স্মরণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কুরআনের বেশ কয়েকস্থানে আল্লাহ্‌কে স্মরণের নির্দেশ এসেছে। একস্থানে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) কর" (৩৩:৪২-৪৩)। অন্য একস্থানে তিনি স্মরণ করার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন। কিছু কিছু দল আছে যারা মিলিতভাবে নেচে কুঁদে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলে যিকর করে থাকে। কিন্তু কুরআন এরূপ যিকর সমর্থন করে না। বরং বলে, "এবং তুমি স্মরণ কর তোমার প্রভূকে নিজ অন্তরে কাকুতি মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এবং তুমি গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না (৭:২০৬)।

এখানে যিকরের পদ্ধতির সঙ্গে সময়ের কথাও বলা হয়েছে। উপরের অন্য উদ্ধৃতিতেও সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র যিকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসেও নামাযের পর দোয়া দ্বারা যিকর করার উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, "হযরত মুয়ায (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত রসূলে করীম (সা.) তাঁর হাত ধরে বললেন, ' আল্লাহ্‌র কসম আমি তোমায় ভালবাসি। আমি তোমাকে তাগিদ

করছি যে, কোন নামাযের পর যেন এই যিকর বাদ না যায়, 'আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়াহুসনি ইবাদাতিকা"। অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য কর তোমাকে স্মরণ করতে, তোমার শোকর করতে এবং উত্তমভাবে ইবাদত করতে" (আবু দাউদ)।

কুরআন পাকে নামাযকেও যিকর বলা হয়েছে (২৯:৪৬) কিন্তু সূরা আরাফের ২০৬ নং আয়াত এবং অন্যান্য স্থানে যে যিকরের কথা বলা হয়েছে তা আলাদা, যা নামাযের পর বা অন্য সময় করতে হয়। যিকরের সময় কলেমা পাঠ একটি উত্তম যিকর। আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নাম নিয়ে যিকর সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে বলেছেন, "তুমি বল, তোমরা আল্লাহ্ বলে ডাক অথবা রহমান বলে ডাক, যেকোন নামে তোমরা ডাকতে পার, কারণ সকল সুন্দর নাম তাঁরই" (১৭:১১১)।

খলীফাতুল মসীহগণ অনেক সময় দোয়ার তাহরীক করে থাকেন। বিভিন্ন নামাযের পর এসব দোয়া পড়া যেতে পারে।

অনেকে নামায শেষ করেই উঠে পড়েন, যেন তারা কত কাজে ব্যস্ত যে নামাযের পর কিছু সময় বসে আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার সময়ও তাদের নেই।

যিকর সম্পর্কে আরও একটি আয়ত তুলে ধরছি। আয়াতটিতে আল্লাহ্‌র স্মরণকারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলা হয়েছে, "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না" (২:৫৩)। যিকর সম্পর্কে আল্লাহ্ এ-ও বলেছেন যে যিকর হৃদয়ে প্রশান্তি আনে (১৩:২৯)।

মিথ্যা বলা: মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ। এটি প্রতিমার ন্যায় অপবিত্র। আল্লাহ্‌র উপর আস্থার অভাবই একজনকে মিথ্যাবাদী বানায়। মিথ্যাবাদী আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মিথ্যাকে ঢাল বানিয়ে রক্ষা পেতে চায়। আল্লাহ্ পাক প্রতিমার ন্যায় মিথ্যা কথা থেকেও দূরে থাকবার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, "অতএব তোমরা প্রতিমা সমূহের অপবিত্রতা হতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা হতেও দূরে থাক (২২:৩১)। আল্লাহ্ এ-ও বলেছেন যে ঈমানের অভাবের কারণেই মানুষ মিথ্যা কথা বলে। বলা হয়েছে, "শুধু তারাইতো মিথ্যা রচনা করে থাকে যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের উপর ঈমান আনেনা, বস্তুত এরাই মিথ্যাবাদী (১৬:১০৬)। আল্লাহ্ আরও বলেছেন যে, মিথ্যাবাদীরা মোনাফেক। যেমন বলা হয়েছে, "কিন্তু আল্লাহ্ এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী" (৬৩:২)।

হযরত রসূলে করীম (সা.) মিথ্যা বলাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, "হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ (কবিরা গুনাহ) সম্পর্কে অবহিত করব না? আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল"। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, মা-বাবার নাফরমানি করা'। এ সময় তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। অত:পর উঠে বললেন, "শুন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, শুন মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। শুন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া"। এভাবে তিনি একাধারে বলে যাচ্ছিলেন যতক্ষণ না আমি বললাম, 'আপনি কি বিরত হবেন না"? (বুখারী)। এখানে মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে কবিরা গুনাহ বলা হয়েছে।

আরও একটি হাদীস শুনুন, "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করিম (সা.) বলেছেন, 'মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলতেই থাকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে পরম মিথ্যাবাদী" (বুখারী, মুসলিম)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ও মিথ্যাকে জঘন্য বিষয় বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ তালা মিথ্যার জন্য কোন মুক্তির ব্যবস্থা করবেন না। মিথ্যার চেয়ে জঘন্য আর কোন বিষয় নেই। সত্য সম্বলিত প্রত্যেকটি কথাই জয়যুক্ত হয়ে থাকে" (আহমদী ও গায়েব আহমদীর মধ্যে পার্থক্য)। বায়আতের শর্তেও মিথ্যা না বলতে বলা হয়েছে।

অনেকে জানে যে মিথ্যা বলা পাপ, তবুও তারা মিথ্যা কথা বলে থাকে। এরা জ্ঞান পাপি। কুরআনের নির্দেশকেও তারা অমান্য করে চলে। কথায় বলে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তবুও উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে মিথ্যাবাদীদের জাহান্নামী বলা হয়েছে।

ওয়াজিব: ফরযের পর আসে ওয়াজিব। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কুরআনে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ইবাদত রসূলে করীম (সা.) পালন করেছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো তার সুন্নাহ হতে পাওয়া যায়। যার মধ্যে পৃথকভাবে পঠিত কিছু নামায এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাঠ কালে যে সকল কাজ করা হয় তার কোন কোন কাজকেও ওয়াজিব বলে। পৃথকভাবে পঠিত নামাযের মধ্যে আছে বিতর ও দুই ঈদের নামায।

ওয়াক্তিয়া নামাযের ভেতর যে সব কাজ ওয়াজিব হিসেবে করা হয় তার মধ্যে আছে:-

১. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাত নামাযে, বা সুন্নত ও নফল নামাযের সমস্ত রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর কুরআন শরীফের কোন অংশ পাঠ করা।

২. রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো, পরিভাষাগত ভাবে যাকে ক্বাওমা বলা হয়। (টীকা- ক্বিয়াম হলো ফরয এবং আবশ্যিক অথচ ক্বাওমা হলো ওয়াজিব অর্থাৎ অতি জরুরী)।

৩. জিলসা- দু'সিজদার মাঝে সংক্ষিপ্ত বৈঠক। প্রথম দু'রাকাত সম্পূর্ণ করে বৈঠক। (শেষ বৈঠক নয়)।

৪. তাশাহ্‌হুদ পাঠ অর্থাৎ আত্তাহিয়াত-লিল্লাহি ওয়াস্‌সালা ওয়াতু.....ক্বাদাহ অবস্থায় পঠনীয়। ইত্যাদি। (দেখুন- সালাত পুস্তিকা, পৃষ্ঠা: ৬০)।

ওয়াজিবের বিষয়গুলি অবশ্যপালনীয়।

পালন করলে সওয়াব, না করলে গুনাহ।

যেহেতু এগুলো নামাযের সাথে সম্পৃক্ত এবং অবশ্য পালনীয় এবং এর সাথে পাপ-পুণ্য জড়িত, সেহেতু সুন্নাহ হতে এলেও এগুলো শরীয়তের অংশ।

সুন্নত: প্রতি ওয়াক্তে ফরয নামায ছাড়াও হুযূর পাক (সা.) আরও কিছু নামায পড়তেন, সেগুলো সুন্নত নামে পরিচিত। এর মধ্যে কিছু আবশ্যিক কিছু ঐচ্ছিক। আবশ্যিক সুন্নতকে বলা হয় সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও ঐচ্ছিক সুন্নতকে বলা হয় সুন্নতে গায়ের মুয়াক্কাদা। সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়লে সওয়াব, না পড়লে গুনাহ বা পাপ। গায়ের মুয়াক্কাদা পড়লে সওয়াব, না পড়লে গুনাহ নেই। এজন্য গায়ের মুয়াক্কাদাকে নফলরূপে গণ্য করা হয়। সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাযগুলো হলো, ফজরের ফরযের পূর্বে দু'রাকাত, জোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত, মাগরিবে ফরযের পর দু'রাকাত ও এশার নামাযের ফরযের পর ও বিতরের পূর্বে দু'রাকাত। গায়ের মুয়াক্কাদা নামাযগুলো হল জোহরের শেষের দু'রাকাত সুন্নতের পর দু'রাকাত, আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত ও মাগরিবের দু'রাকাত সুন্নতের পর দু'রাকাত (সালাত পুস্তক, পৃষ্ঠা: ৫২-৫৩)।

এছাড়া রসূলে করীম (সা.) কিছু ব্যবহারিক কাজকেও সুন্নত হিসেবে অনেকে পালন করেন। যেমন দাঁড়ি রাখা, মোচ ছোট রাখা, ঢিলে পোষাক পড়া। এ-ও মধ্যে দাড়ি রাখা ও মোছ ছোট রাখার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়ে থাকে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফাগণ দাঁড়ি রাখার উপর জোর দিয়ে থাকেন। জামাতের নির্বাচনের সময় ওয়াহদেদারদের দাড়ি আছে কিনা লক্ষ্য করা হয় এবং দাড়ি রাখার তাগিদ দেয়া হয়।

নামায পড়ার সময় যে সব কাজ করা হয় তার ভেতরও সুন্নত আছে। যেমন-

১) তাকবিরে তাহরিমার সময়ে হাত কানের লতি পর্যন্ত তোলা।

২) দাঁড়ান অবস্থায় হাত বাঁধা।

৩) সানাহ পাঠ করা।

৪) সূরা ফাতিহা পাঠের পর আমিন বলা।

৫) রুকুর সময় কমপক্ষে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম পাঠ করা।

৬) সিজদাতে থাকা অবস্থায় কমপক্ষে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আলা পাঠ করা।

৭) শেষ বৈঠকের সময় দরুদ শরীফ ও অন্যান্য দোয়া পাঠ করা।

৮) জিলসা বা বসা অবস্থায় নির্ধারিত দোয়া পাঠ করা। ইত্যাদি (সালাত পুস্তক, পৃষ্ঠা: ৬০-৬১)।

নফল: নফল অর্থ অতিরিক্ত। কিছু নামায আছে যা অতিরিক্ত হিসেবে পড়া হয় যা ঐচ্ছিক। এগুলোকে নফল নামায বলে। এ নামায পড়লে সওয়াব, না পড়লে গুনাহ নেই। ওয়াক্তিয়া নামাযের পর বা যেকোন সময় যত খুশি এ নামায পড়া যায়। এছাড়া আরও কিছু নফল নামায আছে যা পৃথকভাবে পড়া হয়। যেমন তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নামায।

নফল নামাযের ভেতর তাহাজ্জুদ নামাযের এক বিশেষ মর্যাদা আছে। নফল হলেও কুরআনে বর্ণিত হওয়ায় এ নামাযের মর্যাদা অনেক বেশী। কুরআনে বলা হয়েছে, "এবং তুমি এর দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর। এটা তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত ইবাদত) স্বরূপ। এতে প্রত্যাশা করা যায় যে তোমার প্রভূ তোমাকে এক বিশেষ মর্যাদায় উন্নিত করবেন" (১৭:৮০)।

আয়াতটি নিজেই এর ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট। আর কোন কিছু বলার অপেক্ষা রাখেনা।

হযরত রসূলে করীম (সা.) ও এ নামাযের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এক হাদীসে এসেছে, "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'তোমার জন্য রমযানের পর শ্রেষ্ঠ মাস হল মহররম এবং নির্ধারিত (ফরয) নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হল গভীর রাত্রের নামায (তাহাজ্জুদ)। (মুসলিম)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ও এ নামাযের জন্য তার অনুসারীদের বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। বয়আতের শর্তের মধ্যেও সাধ্যমত তাহাজ্জুদ নামায পড়ার উল্লেখ আছে।

এ নামায আট রাকাত। শেষ রাত্রে উঠে দু'রাকাত করে পড়তে হয়। হাদীসে আছে যে, শেষ রাত্রের দোয়া কবুল হয়। এজন্য তাহাজ্জুদ নামায দোয়া কবুলিয়তের উপযুক্ত সময়।

নফল নামায না পড়লে গুনাহ নেই জন্য এ নামাযের উপর কম গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এ নামায ফেলনা নয়। কাল কিয়ামতের ময়দানে এ-ও পালনকারীরা এর জন্য উপকৃত হবে। এ সম্পর্কে এক হাদীসে বলা হয়েছে "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দাদের নিকট প্রথম যে বিষয়ের হিসেব লওয়া হবে তা নামায। যদি হিসেব ভাল না হয় তবে আল্লাহ্ বলবেন, 'দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি? যদি নফল থাকে তবে ফরযের ঘাটতি সেই নফল নামায দ্বারা পূরণ করা হবে। সেরূপ তার বাকী আমল দেখা হবে এবং পরীক্ষা করা হবে" (তিরমিযী-কিতাবুস সালাত)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এ সম্পর্কে বলেছেন, "বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে মু'মিন নফল নেকী দ্বারা আল্লাহ্ তালার এরূপ নৈকট্য লাভ করবে যে আল্লাহ্ তার চক্ষু হয়ে যান যা দ্বারা সে দেখে এবং কান হয়ে যান যা দ্বারা সে শুনে এবং হাত হয়ে যান যা দ্বারা সে ধরে। আর এক হাদীসে আছে, 'আমি তার জিহ্বা হয়ে যাই যা দ্বারা সে কথা বলে"। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, 'যে আমার ওলীদের সাথে শত্রুতা করে সে যেন আমার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত থাকে"। (মালফুযাত-৭ম খণ্ড)।

নফল ইবাদতের ভেতর নফল রোযাও একটি। হযরত রসূলে করীম (সা.) প্রতি

মাসে নফল রোযা রাখতেন। নফল রোযা রাখা সম্পর্কে একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, "হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, "জনৈক নজদবাসী রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এল। তার মাথার চুলগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত। আএ-ওা তার গুণগুণ আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু সে কি বলছিল তা বুঝছিলাম না। শেষে সে কাছে এসেই ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। হযরত রসূলে করীম (সা.) বললেন, 'দিন রাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায'। সে বলল, 'এছাড়া আমার আর কোন কর্তব্য আছে কি'? তিনি বললেন, 'না, তবে অতিরিক্ত (নফল) পড়তে পার'। রসূলে করীম (সা.) বললেন, 'আর রমযানের রোযা'। সে বলল, 'এছাড়া আমার আর কোন কর্তব্য আছে কি?' তিনি বললেন, 'না, তবে নফল (রোযা) রাখতে পার' রাবি (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এছাড়া আমার আর কোন কর্তব্য আছে কি?' তিনি বললেন, 'না, তবে নফল দান করতে পার'। রাবি বললেন, 'এর পর সে ব্যক্তি একথা বলতে বলতে ফিরে গেল, "আল্লাহ্‌র কসম, আমি এর বেশীও করব না, কমও করব না'। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'লোকটা যদি সত্য কথা বলে তবে সে সফলকাম হয়েছে' (বুখারী-কিতাবুল ঈমান)।

হাদীসটি হতে জানা গেল যে দানের মধ্যেও নফল আছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ও নফল রোযার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি প্রতি মাসেই রোযা রাখতেন। একবার তিনি ছয় মাস এক নাগাড়ে রোযা রেখে ছিলেন। তিনি বলেছেন যে রোযা তাযকিয়ায় কালব বা আত্মার উজ্জলতা দান করে। খলীফাতুল মসীহগণও প্রতিমাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। বর্তমান খলীফা সাহেবও কিছুদিন পূর্বে প্রতি মাসে চারদিন রোযা রাখতে বলেছেন' অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে একদিন।

আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। নামায পড়ার সময় যে সব কাজ করা হয় তার ভেতর ফরয ওয়াজিব সুন্নতের ন্যায় আরও কিছু বিষয় আছে, যাদের মুস্তাহাব বলে, যার অর্থ পছন্দনীয় বা প্রশংসনীয়। যদিও এগুলো নামাযের আবশ্যিক বা জরুরী বা সুন্নত হিসেবে গণ্য নয় তবুও নামাযের সময় এদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। এগুলো নামাযের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। মোস্তাহাবের কয়েকটি বিষয় নিম্নে দেয়া গেল-

১. নামায পড়াকালে একজনের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ রাখা যেখানে সিজদার সময় তার মাথা মাটি স্পর্শ করবে।

২. রুকু করার সময় তার হাত হাঁটুর উপর ছড়িয়ে রাখা।

৩. এমনভাবে সিজদাহ দেয়া উচিৎ যেন প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত এবং পরে নাক ও কপাল মাটি স্পর্শ করে।

৪. সূরা ফাতিহা পাঠের পর কুরআন মজিদের আয়াত পাঠের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় বেশী আয়াত পাঠ করা হয়।

৫. ক্বাদাহ এবং জিলসা অবস্থায় বা বৈঠকের সময় বাম পায়ের উপর বসতে হবে এবং ডানপাটি এমনভাবে খাড়া থাকবে যেন পায়ের আংগুলগুলো কিবলামুখি থাকে। ইত্যাদি (সালাত পুস্তক- পৃ:৬১-৬২)।

অনেকে জিলসা বা বৈঠকের সময় বামপায়ের পাতার উপর ডান পায়ের পাতা বিছিয়ে বসেন। এটা সঠিক নয়। অবশ্য পায়ের সমস্যা থাকলে অন্য কথা।

আশা করি প্রবন্ধটি হতে শরীয়ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে এবং এ-ও জানা হয়েছে যে শরীয়তের প্রতিটি বিষয় স্ব-স্ব স্থানে সমগুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে শরীয়ত সম্পর্কে জানা ও পালনের তৌফিক দিন।

আমীন অনুষ্ঠান

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকাস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের দারুত তবলীগ কেন্দ্রীয় মসজিদে শাহ্ মোহাম্মদ কাশিফ আমিন ও শাহ্ মোহাম্মদ কাশিম আমিন, পিতা: মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মুরব্বী সিলসিলাহ, বাংলাদেশ-এর 'আমীন অনুষ্ঠান' হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। তারা দু'জনেই ওয়াকফে নও।

একই সাথে আতাউল মালেক জাফির, পিতা: ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদুল হাসান-এর আমীন অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। তাদের সকলের সার্বিক উন্নতি ও তারা যেন সত্যিকার অর্থে জামা'তের সেবক হয় এ জন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী

ক্বারী নঈমুদ্দিন স্মরণে

(আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের পিতা)

খন্দকার মাহবুব-উল-ইসলাম

ক্বারী নঈমুদ্দিন! মর্দে মু'মিন, জেনারেল তুমি মাহ্‌দীর,
আজও তব স্মৃতি স্মরে অশ্রু ঝরে, হে বাংলার মহাবীর ॥

ফিরিশ্‌তাতুল্য পুত্র তব মতিউর আর জিল্লুর রহমান
হৃদয় তাদের হল রোশনাই শুনে মসীহ্‌র আহ্বান।
মাহ্‌দীর ডাকে দেওয়ানা দু'জন ঈমানের বলে বলীয়ান
কাফের হয়েছে ভেবে– নিজ গৃহে দিলে নাকো তাদের স্থান।
সোনার টুকরা পুত্র দু'জনা মতিউর আর জিল্লুর রহমান
ধরণীর সেরা ধন পেয়ে তারা ছুটলেন কাদিয়ান-দারুল আমান।
ফেলে আসা বাড়ি-ঘর-ঐশ্বর্য সব তুচ্ছ জগতের যত মাল-সামান,
মাহ্‌দীর ডাকে সাড়া দেওয়াতে কত সুখ, আনন্দ অফুরান।
মাহ্‌দীকে পেলে সালাম জানাবে– এ যে মহানবীর ফরমান,
মহান এ বাণী মেনে নিলে শান্তি, হবে সব সমস্যার সমাধান।

অজ্ঞানতার আঁধার যুগেও তব গৃহে ছিল জ্ঞানের আলো,
কুরআনের আলো দিয়ে তুমি পুত্রদেরে করেছ সবার চেয়ে ভালো।
হে খোদা! দাও হেদায়াত, কাঁদেন কাদিয়ানে জিল্লুর প্রিয় পিতার জন্য,
হেদায়াত পেয়ে প্রিয় পিতার জীবনও যেন হয় আমাদের মত ধন্য।
ক্বারী সাহেব যেন ঈমান আনেন– দোয়া করলেন খলীফাতুল মু'মিনীন,
সাথে সাথে ফল– ঈমানের জ্যোতিতে হলেন আপ্লুত ক্বারী নঈমুদ্দিন।
নব উদ্যমে বীরবিক্রমে ক্বারী নঈমুদ্দিন ঈমানের বলে বলীয়ান,
আশে-পাশে দ্রুত ছড়ালেন তিনি মসীহ্‌র বাণী আর রসূলের ফরমান।

একদা তিনি দেওয়ানা হয়ে ছুটলেন কাদিয়ান-দারুল আমান,
দুনিয়ার মাঝে জান্নাত হেরি বিমোহিত হল তার মন-প্রাণ।
কি অপরূপ শান্ত-স্নিগ্ধ, সবই যেন পুষ্প দিয়ে গড়া,
ঘৃণার সেথায় নেইকো লেশ, ভালোবাসা দিয়ে সব ভরা।
দিকে-দিকে ছড়াতে ইসলামের বাণী আর শত্রুর ষড়যন্ত্র করতে ধূলিসাৎ,
খলীফার হুকুমে ছুটছে সবাই ইসলামকে আবার করতে আবাদ।

হেনকালে হিন্দুদের ইসলামের বিরুদ্ধে শুরু হল শুদ্ধি আন্দোলন–
মালকানার সব মুসলমানকে হিন্দু করতে করল কঠিন পণ।
খলীফা সানী দিলেন ঘোষণা, কে যাবে ঠেকাতে শুদ্ধি আন্দোলন,
নিজ খরচে তবলীগি সফরে দিতে হতে পারে জীবন বিসর্জন।
প্রিয় খলীফার শুনে আহ্বান– বললেন বৃদ্ধ ক্বারী নঈমুদ্দিন,
আমার ছেলে জিল্লুর রহমান ও বি.এ. ক্লাশের ছাত্র মতিউর রহমান–
এ মহান কাজে আল্লাহ্‌র রাহে তাদের করিলাম আমি দান,
এতটুকু অশ্রু ঝরবে না হুযূর, এ পথে যদি যায় তাদের প্রাণ।
এরপরে হুযূর– আছে আমার তৃতীয় পুত্র মাহবুবুর রহমান,
শুকরিয়া জানাব খোদার কাছে যদি এ পথে সেও হয় কুরবান।

হুযূর! আমার থাকতো যদি আরো দশ পুত্র সন্তান,
ইসলামের সেবা দিতে গিয়ে যদি তাদেরও যায় প্রাণ।
কিঞ্চিত পাবো না দুঃখ– এ মৃত্যু কত যে মহান,
দৃঢ় কণ্ঠে বলছি হুযূর, ত্যাগের এ আনন্দ কত অফুরান।
এ মহান ডাকে সাড়া দিয়ে যদি আমার জীবনও দিতে হয় বিসর্জন,
সৌভাগ্য অপার তা হবে আমার প্রাণের শ্রেষ্ঠ উপার্জন।
ঈমানে দীপ্ত তেজে তৃণ-সম গেল ভেসে, হিন্দুদের সেই শুদ্ধি আন্দোলন,
সোনালী অক্ষরে লেখা হল সেথায় ক্বারী নঈমুদ্দিনের নাম।

১৯৮৪ সনে শ্বেতপত্র ছাপালো নাদান জিয়াউল হক– দিয়ে মিথ্যা অপবাদ,
দাঁত ভাঙা জবাব দিলেন আল্লাহ্‌র খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ।
শোনালেন তিনি দেশের জন্য-ইসলামের জন্য আহমদীদের কুরবানী সীমাহীন,
যার মাঝে অনন্য ছিলেন বীরত্বগাঁথা মাখা বাংলার বীর ক্বারী নঈমুদ্দিন।
ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর সে ইতিহাস কত যে মধুর– কত যে অশ্রু-মাখা,
আজও আলোড়ন তোলে শোণিতে-শোণিতে, যুগে-যুগে যেন পাই তাদের দেখা।

ক্বারী নঈমুদ্দিন মর্দে মু'মিন বাংলার তুমি মহাবীর
আজও তব স্মৃতি স্মরে অশ্রু ঝরে হে বাংলার মহাবীর ॥

ইসলামের জীবন বাঁচাতে তুমি পুত্রদেরে দিতে চেয়েছিলে কুরবানী
করেছেন অমর বিশ্ববিধাতা– যিনি সবার অন্তর্যামী।

এক পুত্র, আমেরিকার মিশনারী ইনচার্জ সূফি মতিয়ার রহমান বাঙালি তার নাম,
কত মৃতকে করেছেন জীবিত শহরে-বন্দরে সর্বত্র ঘুরে অবিরাম।
যাদুকরি তার লেখা পড়ে আর বক্তৃতা শুনে ঈমান এনেছে কত খ্রিষ্টান-ইহুদী-বেদ্বীন,
বাংলার গর্ব তিনি, আহমদীয়াতের ইতিহাসে চির-অমলিন।

আরেক পুত্র, বাংলার নক্ষত্র মরহুম আল্লামা জিল্লুর রহমান,
অবিভক্ত বাংলার মোবাল্লেগ তিনি, অবিস্মরণীয় তার নাম।
হাদীসুল মাহদী তার অবিনশ্বর কীর্তি পড়ে কত জনে এনেছে ঈমান,
স্বনামধন্য তারই পুত্র– এডভোকেট মুজিবুর রহমান।

ক্বারী নঈমুদ্দিনের তৃতীয় পুত্র, মৌলভী মাহবুবুর রহমান,
চিরনিদ্রায় শায়িত তিনি বেহেশতী মাকবেরা, কাদিয়ান-দারুল আমান।
ক্বারী সাহেবের বড় ছেলে এডভোকেট মুজিবের শ্বশুর বজলুর রহমান,
কাদিয়ান থেকে হিজরত করে সমাহিত তিনি বেহেশতী মাকবেরা রাবওয়া-পাকিস্তান।
অমর জীবনের যে বীজ তুমি বপন করেছিলে ক্বারী নঈমুদ্দিন,
ফুলে-ফলে তা শত শত আজি সুশোভিত রবে চিরদিন।
আমরাও যদি চাই অমর হতে, এসো– শপথ নেই, করি দৃঢ় অঙ্গীকার,
কুরআনকে ধারন করে খিলাফতের ছত্র ছায়ায় রাখবো সন্তান-পরিবার।

ক্বারী নঈমুদ্দিন মর্দে মু'মিন, জেনারেল তুমি মাহ্‌দীর,
আজও তব স্মৃতি স্মরে অশ্রু ঝরে, হে বাংলার মহাবীর ॥

নান্দনিক শিক্ষাসফর কক্সবাজার

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেছেন, "সী-রু ফীল আরয" অর্থাৎ- তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো। এ আদেশটি এজন্য দেয়া হয়েছে যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার অপার মহিমা এবং তাঁর দৃষ্টিনন্দন সৃষ্টিকে দেখে তাঁরই পদতলে লুটিয়ে যাই। এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি ইবাদাত। এই ধারাবাহিকতায়, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এবং চট্টগ্রাম সালানা জলসায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকা ২০১৭ সালের শিক্ষাসফর সম্পন্ন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত শিক্ষাসফরে মোট ৩৬ জন খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন। ঢাকার কায়েদ সাহেব জনাব মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের নেতৃত্বে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১০ ঘটিকায় বকশীবাজার হতে দোয়ার মাধ্যমে আমরা কক্সবাজরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। পরদিন ভোর ৬ টায় আমরা কক্সবাজার পৌঁছে বাজামাত ফজরের নামায আদায় করি। নাযেম খাদ্য ও আবাসন সাহেব, তিনি আমাদের থাকার সুব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। জিয়া গেস্ট হাউসে আমাদের জন্য মোট ৬টি রুম বরাদ্দ ছিল। কায়েদ সাহেব এই ৬টি রুমের নাম দেন সাদাকাত, খিলাফত, রাফাকাত, আল-ওসীয়্যত, নবুওয়্যত এবং মালফুযাত। তিনি ৩৬ জন খোদ্দামকে মোট ৬ ভাগে ভাগ করে আগে থেকেই রুম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। নাস্তা করার পর কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে আমরা চলে যাই সমুদ্র সৈকতে। এই সমুদ্র সৈকত বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি, উচ্ছ্বসিত সমুদ্র তরঙ্গ, দিগন্ত প্রসারী ঝাউবন, উঁচু পাহাড়ের চূড়া, সুদৃশ্য প্যাগোডা, বৌদ্ধ মন্দির ইত্যাদি নিয়ে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। ইংরেজ ক্যাপ্টেন মি. হেরাম কক্স এর নামানুসারে এ জায়গার নামকরণ করা হয় কক্সবাজার। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১২০ কি.মি। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা সংরক্ষিত বনভূমি সমৃদ্ধ ৯৬ কি.মি. পাহাড়ের সারি এখানকার অন্যতম বিরল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বলে বিবেচিত। সমুদ্রতট ঘেঁষে গড়ে উঠেছে কটেজ, মোটেল এবং হোটেল রেস্তোরা। আমরা যখন সমুদ্রে নামি তখন জোয়ার চলছিল। প্রতিটি ঢেউ এর আকৃতি ছিল বিশাল। এই বিশাল ঢেউয়ের সাথে সমঝোতা করে সমুদ্রে মজা করার যে আনন্দ তা যে সমুদ্রে নামেনি তার পক্ষে বুঝা অসম্ভব। আমরা প্রায় তিন ঘন্টা সমুদ্রে গোসল করি। এরপর আমরা হোটেলে ফিরে আসি। আমরা যখন জুমুআ এবং আসরের নামায জমা করার সময় গয়ের আহমদী মোল্লাও নামাযে অংশগ্রহণ করেছে। জুমুআ শেষ করে যখন আসরের কসর আদায় করবো তখন তারা বলে যে "ওরা তো কাইদ্দানি এদের পিছনে আমরা নামায আদায় করব না"। এই বলে তারা স্থান ত্যাগ করে। উল্লেখ্য, আমরা যেখানে নামায আদায় করেছি সেই ভবনটির দেয়ালে খতমে নবুওয়তের অনেকগুলো পোস্টার লাগানো ছিল। এতে লেখা ছিল- "অনতিবিলম্বে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হোক"। যাহোক অতঃপর আমরা দুপুরের খাবারের জন্য চলে যাই। বিকাল তিনটায় ইনানী বিচের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। এজন্য দুটি চান্দের গাড়ি ভাড়া করা হয়। কক্সবাজার থেকে ইনানী বিচের দূরত্ব প্রায় ২৯ কি.মি। এ পথের এক পাশে সাগর অন্য পাশে পাহাড়। দুই পাশে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা ইনানী বিচে পৌঁছাই। এ বিচের বড় বড় পাথর ছিল আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আমরা যখন ইনানী বিচে পৌঁছাই তখন ছিল ভাটার সময়। সমুদ্রের পাড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন ফিরে আসি তখন সবে মাত্র জোয়ার শুরু হচ্ছে। দেখলাম সমুদ্রের পাড়ে জেগে থাকা পাথরগুলো ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। ফেরার পথে আমরা সূর্যাস্তের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন করি। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে এবং ইনানী বিচে আমরা গ্রুপ ফটোসেশন করি। হোটেলে ফিরে বা-জামাত মাগরিব ও এশার নামায আদায় করি। নামায আদায়ের পর হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি ব্যক্তিগত মোবাইল ইন্টানেটের মাধ্যমে গ্রুপ করে দেখা হয়। রাতে সবাই নিজেদের ব্যক্তিগত কেনাকাটার পর্ব সেরে নেই। সর্বশেষে সামুদ্রিক মাছ দিয়ে আমরা রাতের খাবার গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম দিনের সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় দিন নাস্তা খাওয়ার পর আমরা চট্টগ্রাম আঞ্চলিক সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। দুপুর ২ টায় আমরা জলসা গাহে পৌঁছাই। চট্টগ্রাম জামাতের সদস্যগণ আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তাদের আতিথিয়তা ছিল অনুকরণীয়। সর্বশেষ জলসা গাহে রাতের খাবার গ্রহণের পর আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করি এবং পরদিন সকালে সহীহ্-সালামতে ঢাকা পৌঁছাই। এ শিক্ষা সফর সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য কায়েদ সাহেব আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা হলেন, এ.বি.এম. মেহেদী হাসান টুইংকেল, আজিজুল হক, রাফি আহমেদ পলাশ, জসিম উদ্দিন চৌধুরী, আল ইকরাম খান (সজিব), ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ কামরুল হাসান (আকবর), শরিফ আহমদ পুষন, সাঈদুর রহমান শিহাব। সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় কায়েদ সাহেবের দূরদর্শিতা ও নিখুত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাসফর সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এভাবে আরো তাঁর অপার সৃষ্টিকে দেখার সৌভাগ্য দান করুন।

সংগ্রহঃ মোহাম্মদ কামরুল হাসান (আকবর)
ও
সংকলনঃ আল ইকরাম খান সজিব

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০১/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার জুমুআর নামাযের পর হতে মাগরিব পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় সভাপতি আসন অলংকৃত করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মোসলিম উদ্দীন আহমদ। অতঃপর বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব মাসুদ আহমদ মামুন।

মোহতরম আমীর সাহেবের দোয়া পরিচালনা এবং উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে জলসার মূল-কার্যক্রম আরম্ভ হয়। মোহতরম আমীর সাহেব অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়, সাবলীল ভাবে মহানবী (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং সাম্প্রতিক বিশ্বের আলোচিত বিষয়গুলো সহ সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হুযূর আনোয়ার (আই.) যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছেন সে বিষয়গুলো তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। অতঃপর বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, (নায়েব ন্যাশানাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ)। তিনি তাঁর বক্তব্যে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শান এবং মর্যাদা সহজ ও সরল সাবলীল ভাষায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত সকলে, বিশেষ করে অ-আহমদী বন্ধুগণ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে জলসার বক্তব্যগুলো শ্রবণ করেন। জলসা শেষে আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে এক প্রশ্নোত্তর-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র হতে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব ছাড়াও উক্ত জলসায় ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ সাহেব, মোহতরম নঈম তফবীজ সাহেব এবং মোহতরমা সদর সাহেবা, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ, উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয়-পর্যায় থেকে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম আব্দুর রহমান সাহেব, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা, মাওলানা খালেদ মুসনাদ খান, মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং মোহতরম ফজল মাহমুদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়নগঞ্জ। ৫৪ জন যেরে তবলীগ মেহমান সহ মোট ২২৬ জন উক্ত জলসায় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর ন্যাশানাল আমীর সাহেব, মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর সাহেবা, ফতুল্লা জামাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহতরম মরহুম আবুল হাশেম বীরপ্রতীক সাহেবের বাসায় গিয়ে তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান।

আব্দুর রহমান, প্রেসিডেন্ট

চট্টগ্রাম জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৮ জানুয়ারী রোজ শনিবার মসজিদ বাইতুল বাসেত, চট্টগ্রামে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা বাদ মাগরিব স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। জলসার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী, এরপর নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ হাসান রিজিওনাল নাযেম, মজলিস আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রাম অঞ্চল। তিনি তার বক্তব্যে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার গুরুত্বের ওপর আলোচনা করেন। অতঃপর স্থানীয় মোয়াল্লেম মোজাফ্‌ফর আহমদ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আহমদ ও মুহাম্মদ গুণাবলীর বিকাশের কথা বর্ণনা করেন। এরপর মুরব্বী সিলসিল্লাহ মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব মূল বক্তব্য তুলে ধরেন। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল মানবতার মুক্তি-দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেন। দরূদ পাঠের গুরুত্ব এবং তাঁকে যে পাঁচটি অনন্য বৈশিষ্ট প্রদান করা হয়েছে, যা পৃথিবীর আর কোন নবী রসূলকে দেয়া হয় নি, এর ওপর তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আহমদী ও মেহমানসহ মোট ৫৯ জন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত মেহমানগণের মধ্য থেকে তিনজন ভাই বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। সভার শেষে স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর আলহাজ্জ নেছার আহমদ সাহেব তার সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, উক্ত জলসা মাগরিব নামায হতে সত্যের সন্ধান অনুষ্ঠান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং আহমদী ও মেহমানগণকে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত করা হয়। পরিশেষে উপস্থিত সকলের জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

এস এম মঈন আল হোসাইনী

মাদারটেক হালকায় তবলীগি সেমিনার ও সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৬ জানুয়ারী, ২০১৭ রোজ শুক্রবার জুমুআ ও আসরের জমা নামাযের পর বেলা ৩ টায় মাদারটেক হালকার উদ্যোগে মসজিদুল হুদায় (মাদারটেক) সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলীগি-সেমিনার অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। পর্যায়ক্রমে আসন গ্রহণ করেন জনাব ইমতিয়াজ আলী, তবলীগ সেক্রেটারী বাংলাদেশ, জনাব তসাদ্দক হোসেন, সেক্রেটারী তবলীগ ঢাকা, মাওলানা সোলাইমান সুমন, মুরব্বী সিলসিলাহ্, আ.মু.জা. বাংলাদেশ এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মাদারটেক হালকা। আরো আসন গ্রহণ করেন মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাহেব, সেক্রেটারী তবলীগ, আ.মু.জা. ঢাকা। সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম আলমগীর, মোন্তাযেম উমুমী, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা। আল্লাহ্‌র ফযলে উক্ত অনুষ্ঠানটি শুরুর পূর্বে জুমুআর নামাযে ১৮৫ জন মুসল্লি নামায আদায় করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিল যেরে তবলীগ বন্ধু ১০ জন এবং লাজনা ৭৬ জন, আলহামদুলিল্লাহ্। জুমুআর নামাযের পর অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মাসরুর সোহেল সাফিন এবং বাংলা নযম পাঠ করেন জারিউল্লাহ্ সাদেক। উর্দ্দু নযম পাঠ করে শুনান জনাব রুমান। সভায় শ্রোতামন্ডলীর উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সীরাত সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর আলোচনা করেন মোহতরম মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। এর পূর্বে বর্তমান প্রেক্ষাপটে রসূল (সা.)-এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন মাওলানা রাসেল সরকার, জনাব তসাদ্দক হোসেন, এবং প্রেসিডেন্ট মাদারটেক হালকা। সর্বশেষ বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা।

শফিকুল হাকিম আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার কর্মশালা

গত ২০ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত মজলিস আনাসারুল্লাহ্, ঢাকার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত কর্মশালায় কেন্দ্র থেকে উপস্থিত ছিলেন নায়েব সদর জনাব শহীদুল ইসলাম বাবুল। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব আমিন আহমদ এবং দোয়া পরিচালনা করেন নায়েব সদর সাহেব। জনাব শফিকুল হাকিম, যয়ীম আলা মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা, সকল আমেলা সদস্যাদের নিজ নিজ পরিচয় ও কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেন। হুযূর (আই.)-এর ১৫ জুলাই ২০১৬, কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া জুমুআর খুতবা সকলের উদ্দেশ্যে পাঠ করেন এরপর নাসির উদ্দিন, নায়েব যয়ীম আলা জনাব জুলফিকার হায়দার মোস্তাযেমগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর জুমুআর নামায ও খাওয়ার বিরতি দেয়া হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে মোস্তাযেমগণের কর্ম-তৎপরতা ও মাসিক-রিপোর্টের ওপর আলোচনা করেন জনাব জাহিদুল ইসলাম আলমগীর, মোস্তাযেম উমুমী, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। এই অধিবেশনে কায়েদ উমুমী জনাব নঈম আলম খান উপস্থিত থেকে মোস্তাযেমগণের কর্মপদ্ধতি ও বিভিন্ন প্রোগ্রাম কিভাবে সফলভাবে করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর ও সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

শফিকুল হাকিম আহমদ

মরহুম আবুল হাশেম বীরপ্রতীক সাহেবের যিক্‌রে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লার সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মোহতরম আবুল হাশেম বীরপ্রতীক সাহেব গত ২৬-১২-২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ৩ মেয়ে, নাতি-নাতনী সহ বহু গুণগ্রাহী বন্ধু রেখে যান।

গত ৩০ ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার আ.মু.জা. ফতুল্লায় "মসজিদ নূর"-এ মরহুমের স্মরণে এক "যিক্‌রে খায়ের" সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আব্দুর রহমান সাহেব, প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা. ফতুল্লা। অনুষ্ঠানে মরহুমের কর্মমুখর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব ডা: আবু নাসির, কাজী মোবাশ্বের আহমেদ সাহেব, খালেদ মুসনাদ খান, মুরব্বী সিলসিলাহ, ডা: কামরুল ইসলাম ও জাফর আহমেদ, (প্রধান সম্পাদক, দৈনিক জন্মভূমি)। মুক্তিযুদ্ধে মরহুম অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন, যার দরুন রাষ্ট্র কর্তৃক সম্মানসূচক "বীরপ্রতীক" উপাধিতে ভূষিত হন। তাছাড়া মরহুম দীর্ঘদিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জামাতের নিরলস-সেবা করে গেছেন।

মরহুম একজন বয়আতকৃত আহমদী ছিলেন। তিনি ১৯৭৮ সালে বয়আত গ্রহন করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মরহুম একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। মরহুমের রূহের মাগফিরাত এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে যেন আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দান করেন, সেজন্য জামাতের সকল সদস্যের নিকট খাসভাবে দোয়াপ্রার্থী।

মোহাম্মদ আব্দুর রহমান

বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের ৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০১৭ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিগঞ্জে সফলতার সাথে সমাপ্ত

আল্লাহ্ তা'লার অসীম কৃপায় গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার ও শনিবার বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসা, ২০১৭ হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবের উপস্থিতিতে অত্যন্ত শান শওকত ও ভাব গাম্ভির্যময় পরিবেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহিগঞ্জের নবনির্মিত মসজিদ আফিয়্যাত প্রাঙ্গনে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান সাহেবসহ তার সফর সঙ্গীদের বহনকারি গাড়ীর বহর ১৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল প্রায় ১১টায় জলসা গাহে এসে উপস্থিত হয়। হুযূর (আই.)-এর সন্মানিত প্রতিতিনিধি গাড়ী থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানান খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম প্রেসিডেন্ট আ. মু. জামা'ত রংপুর ও অফিসার সালানা জলসা কমিটি, রংপুর অঞ্চল।

১৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকাল ২.৪৫ থেকে জলসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব, হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মৌলভী আসলাম আহমদ। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব নাজমুস সাকলাইন শাকির। সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। ভাষণে তিনি খিলাফতের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার আহ্বান জানান। বিশেষ করে হুযূর (আই.)-এর খুতবাসমূহ নিয়মিতভাবে শ্রবণ এবং সে অনুযায়ী নিজেদের আমলকে সুন্দর করে সাজানোর পরামর্শ দেন। বক্তৃতা পর্বে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলী বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এরপর বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব জামাল উদ্দীন প্রামাণিক, প্রেসিডেন্ট চড়াইখোলা। বিশ্ব শান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মাওলানা নাভিদুল ফাতাহ (গুজরাট, ভারত)। বিশ্ব শান্তি বনাম ইসলামের শিক্ষা এ বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যশনাল আমীর।

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের পরিচালনায় প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জামা'ত থেকে এতে প্রায় ১৬৯ জন জেরে তবলীগ মেহমান অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে ৬ জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে শামিল হন, আলহামদুলিল্লাহ্।

দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯.৩০ মি. থেকে শুরু হয়ে দুপুর ১২.৩০ মি. পর্যন্ত চলে। রংপুরের প্রেসিডেন্ট ও ৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসার অফিসার জনাব খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াত করেন জনাব সৈয়দ আহমদ দেওয়ান (যয়ীমে আলা, সৈয়দপুর)। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব নাসের আহমদ সানী (মাহিগঞ্জ)। বক্তৃতা পর্বে কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য, ঐশী নিদর্শনের আলোকে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা, পর্দার গুরুত্ব ও সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে মাওলানা আব্দুল মতিন মুরব্বী সিলসিলাহ্, মোহতরম খলিলুর রহমান, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ। এ পর্যায়ে একটি বাংলা নযম পেশ করেন জনাব নাসের আহমদ। মালী কুরবানী ও ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুন্দর বক্তব্য রাখেন মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ-খলীফার ভূমিকা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৫ আ. মু. জামা'ত, বাংলাদেশ।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে বিকাল ২.৪৫মি. থেকে সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। এখানে বাজামাত নামাযের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয় দু'টির উপর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমিন মুরব্বী সিলসিলাহ ও মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব জি.এম. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা)। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুর রউফ পাটোয়ারী, সভাপতি, ২৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ, মাহিগঞ্জ। জলসায় আল্লাহ্ তা'লার সীমাহীন শুকরিয়া জ্ঞাপনের পাশাপাশি হুযূর (আই.)-এর সন্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ এবং শ্রদ্ধেয় ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান সাহেব সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম, অফিসার ৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসা, রংপুর।

এরপর সমাপনী অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি মোহতরম মোবাশশের উর রহমান সাহেব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও দিক-নির্দেশনামূলক মূল্যবান সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তার ভাষণে মহান আল্লাহ্‌র শাশ্বত বাণী পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশানুযায়ী সবাইকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। তিনি তার ভাষণে আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম ও খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য বজায় রেখে চলার জন্য সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। ভাষণে তিনি প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপরে বিগলিত চিত্তে তিনি দোয়া পরিচালনা করেন এবং ঈমান উদ্দীপক এই মহতী জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দেশের ৪০টি জামা'ত থেকে প্রায় ১০০০জন আহমদী উক্ত জলসায় যোগদান করেন। এ ছাড়া বেশ কিছু অ-আহমদী নেতৃবৃন্দ উক্ত জলসায় অংশগ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ্‌র নিকট সংশ্লিষ্ট সবার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম
অফিসার, ৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসা
বৃহত্তর রংপুর

শোক সংবাদ

(১) গত ১৬/০১/২০১৭ রোজ সোমবার বিকাল ৩.৫০ ঘটিকায় বড়চর জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আবু নছর মোহাম্মদ মাসুদ সাহেব (৮৮) পিতা মরহুম হাজী আব্দুছ সোবহান বড়চরে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ ও শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি তবলীগে পারদর্শী ছিলেন এবং পবিত্র কুরআনের প্রয়োজনীয় অনেক আয়াতই তার মুখস্থ ছিল। এমনিতে তিনি আলেম পাশ ছিলেন। মরহুম সদালাপী, সুবক্তা, প্রাজ্ঞ, বিনয়ী ও নিরহংকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আহমদী, গয়ের-আহমদী সবার নিকটই প্রিয় ছিলেন। মরহুম স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্‌র ফজলে সবাই সুশিক্ষিত ও জামাতের সেবাদানকারী। মরহুমের কনিষ্ঠ কন্যা ডেনমার্কে অবস্থান করার কারণে পিতার বিদায়ক্ষণে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। আল্লাহ্ পাক মরহুমের আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকাম দান করেন এবং মরহুমের পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারন, ইহকাল ও পরকালের সফলতা দান করেন সেজন্য জামাতের সর্বস্তরের সদস্যগণের নিকট দোয়ার আবেদন করছি। বিগত ২০.০১.২০১৭ শুক্রবার জুমুআর আগে মরহুমের যিকরে খায়ের অনুষ্ঠানে দুইজন হিন্দু ভাইসহ ২০-২২ জন উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা মরহুমের চারিত্রিক-সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য প্রদান করেন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

(২) ঘটুরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাবেক যয়ীম আলা জনাব মোহাম্মদ রশিদ মিয়া সাহেব গত ২৯/০১/২০১৭ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ৮-২০ মিনিটে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই মেয়ে, সাত নাতি আর আট নাতনী ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমরা সকলে তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করছি। আল্লাহ্ তাঁর রূহের মাগফেরাত করুন, এজন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ দুলাল মিয়া

(৩) অতীব দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, নাসেরাবাদ জামাতের সানাত ও তেজারত সেক্রেটারী আব্দুল হামিদ গত ১৪/০১/২০১৭ তারিখে তার নিজ বাসভবনে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।) আল্লাহ্ তাঁর রূহের মাগফেরাত করুন, এজন্যে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

এ.এইচ.এম. জহির উদ্দীন

ওয়াকফ-ই-জাদীদ ২০১৭ সালের ওয়াদা প্রেরণ প্রসঙ্গে

গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে বিগত বৎসরের ওয়াকফ-ই-জাদীদ-এর বছর শেষ হলো। হুযূর আনোয়ার (আই.) জানুয়ারী মাসের ১ম সপ্তাহে ওয়াকফ-ই-জাদীদ-এর ৬০তম বৎসরের ঘোষণা প্রদান করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। নিখিল বিশ্বে প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়াতের ইতিহাসে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া মোজাহেদীনের সংখ্যা ও চাঁদার পরিমাণ এবং উল্লেখযোগ্য ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে হুযূর (আই.) ওয়াকফ-ই-জাদীদ নতুন বৎসরের ঘোষণা প্রদান করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ঘোষণার মাধ্যমে এটা স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, আমরা বাংলাদেশীরা যেন কোন অবস্থাতেই ওয়াকফ-ই-জাদীদ-এর এই নতুন বৎসরের ঘোষণার বাইরে না থাকি অর্থাৎ সদ্যজাত শিশু থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে উক্ত তাহরীকের আওতায় সম্পৃক্ত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে এখন থেকেই বাংলাদেশের আওতাধীন সকল স্থানীয় জামাত ভিত্তিক ওয়াদা এবং মোজাহেদীন এর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

প্রকৃত মোমেনের প্রতিটি পদক্ষেপ পূর্বের তুলনায় অগ্রসরমান হয়ে থাকে। তাই সকলকে বিগত বৎসরের ওয়াদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০১৭ সালের ওয়াদার পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে। সেই সাথে মোজাহেদীন-এর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ করা হচ্ছে। এই বৎসর অর্থাৎ ২০১৭ সালে যেন হুযূর (আই.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক এই তাহরীকে অর্থাৎ ওয়াকফ-ই-জাদীদ-এর আওতায় স্থানীয় জামা'তের প্রত্যেকেই নিজেকে অর্ন্তভূক্ত করে এবং পরিবারের প্রত্যেকের নাম অন্তর্ভূক্ত করাতে যেন তৎপর হোন।

সুতরাং বাংলাদেশের সকল স্থানীয় জামাত ২০১৭ সালের ওয়াদা সংগ্রহ পূর্বক (মোজাহেদীন সংখ্যা ও টাকার পরিমাণসহ) জরুরী ভিত্তিতে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বরাবরে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর ঐশী সিলসিলার বেশী বেশী খেদমত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ গোলাম কাদের
সেক্রেটারী ওয়াকফ-ই-জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
মোবাইল নং: ০১৫৩৮-৮৬৬৫৯২,
০১৭১২-৫৩৯৮০৯

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন

হুযূর(আই.)-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের খুতবার আলোকে প্রস্তুতকৃত

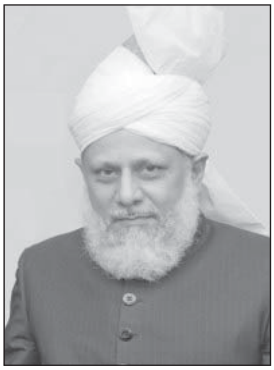

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)

১। আমরা কি বয়াতের ১০টি শর্ত গত বছর যথাযথভাবে পালন করেছি?

২। আমরা কি শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পেরেছি?

৩। আমরা কি লৌকিকতামুক্ত আমল করতে পেরেছি? অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য নয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য কাজ করতে পেরেছি?

৪। আমরা কি প্রবৃত্তির সুপ্ত লালসা ও বাসনামুক্ত আমল করতে পেরেছি?

৫। আমাদের নামায, রোযা ও সদকা-খয়রাত ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, মানবসেবার যাবতীয় কাজ বা ঐশী জামাতের কাজে প্রদত্ত সময় কি কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছিল? নাকি এসব নিছক লৌকিকতা এবং মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা করেছি?

৬। আমাদের মনের সব সুপ্ত-বাসনা খোদাপ্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো?

৭। গত বছরটি আমরা কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা পরিহার করে এবং সত্যে অবিচল থেকে অতিক্রান্ত করেছি?

৮। আমরা কি নিজের ক্ষতিসাধন করে হলেও সর্বাবস্থায় সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করতে পেরেছি?

৯। মনের মাঝে নোংরা ও অশ্লিল চিন্তাধারার উদ্রেক করে– আমরা কি নিজেদেরকে এমন সব আয়োজন ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছি?

১০। টিভি, ইন্টারনেটে পরিবেশিত অথবা এমনসব অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো দেখলে অন্তরে নোংরা চিন্তাধারা জন্ম নেয় আমরা কি এসব পরিহার করতে পেরেছি? (যদি এর উত্তর 'না' হলে আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ)

১১। আমরা কি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বা করে চলেছি?

১২। আমরা কি বিগত বছরে দুষ্কর্ম ও পাপাচারের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি? [উল্লেখ্য, মহানবী(সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়াও দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা বলে গণ্য।]

১৩। আমরা কি নিজ নিজ গণ্ডিতে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচারের পথ পরিহার করতে পেরেছি?

১৪। আমরা কি সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

১৫। আমরা কি সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি? [চরম দুরাচারী এবং পর-নিন্দুক ও পরচর্চাকারীকেও মহানবী(সা.) নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়েছেন।]

১৬। আমরা কি সব ধরনের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি?

১৭। আমরা কি গত বছর নিজেদেরকে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি? (সর্বস্তরে অশ্লীলতা ও সর্বগ্রাসী নগ্নতার এ যুগে রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করাও একটি জিহাদ।)

১৮। আমরা কি গত বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে আদায় করতে পেরেছি? (কেননা নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।)

১৯। আমরা কি বিগত বছরে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট ছিলাম? [মহানবী(সা.) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট থেকো, কেননা এটি খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈকট্যলাভের উত্তম পন্থা এবং এর অভ্যাস মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পাপমোচন করে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে এটি রক্ষা করে।]

২০। আমরা কি হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জন্য নিয়মিত বিনা ব্যতিক্রমে দরুদ পাঠ করেছি ও এখনও করে যাচ্ছি? (বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ আদেশ আর দোয়া গৃহীত হবার একটি কার্যকর মাধ্যম।)

২১। আমরা কি নিয়মিত ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২২। আমরা কি নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২৩। আপন-পর নির্বিশেষে যে কাজ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেয়– আমরা কি এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি?

২৪। আমাদের কথায় বা কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়– আমরা কি এমনভাবে বছরটি কাটিয়েছি?

২৫। আমরা কি মানুষের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনাসূলভ আচরণ করতে পেরেছি?

২৬। বিগত বছরে বিনয় ও নম্রতা কি আমাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল?

২৭। সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে বা বিপদে– সর্বাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি?

২৮। বিপদাপদের সময় আমরা আল্লাহকে অভিযুক্ত করে ফেলি নি তো?

২৯। সামাজিক কদাচার ও প্রবৃত্তির মোহ থেকে আমরা কি নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি?

৩০। আমরা কি কুরআন শরীফ ও মুহাম্মদ(সা.)-এর নির্দেশাবলী ষোল আনা পালনে সচেষ্ট ছিলাম?

৩১। আমরা কি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পেরেছি?

৩২। আমরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি? (কেননা শিরকের পর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হল সবচেয়ে বড় আত্মিক পাপ।)

৩৩। গত বছরটিতে আমরা কি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছি?

৩৪। আমরা কি সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতার বৈশিষ্ট অবলম্বন করতে সচেষ্ট থেকেছি?

৩৫। গত বছরের প্রতিটি দিন কি আমরা ধর্মসেবায় এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছি?

৩৬। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করে থাকি তা সারশূন্য বা বুলি সর্বস্ব নয় তো?

৩৭। আমরা কি ধর্ম সেবাকে নিজেদের ধন-সম্পদের ওপর স্থান দিতে পেরেছি?

৩৮। আমরা কি ধর্মকে নিজ মান-সম্ভ্রমের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে পেরেছি?

৩৯। আমরা কি ধর্মকে নিজ সন্তানদের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করতে পেরেছি?

৪০। আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলাম?

৪১। আমরা কি আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে সচেষ্ট ছিলাম?

৪২। আমরা কি নিজেদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৩। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৪। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সাথে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ও আনুগত্যের সম্পর্ককে আমরা কি ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যার তুলনায় জগতের সকল সম্পর্ক তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়?

৪৫। আমরা কি গত বছর আহমদীয়া খেলাফতের সাথে নিবিড় ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি?

৪৬। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে আহমদীয়া খেলাফতের সাথে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি? আর এদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবার জন্য কি দোয়া করেছি?

৪৭। আমরা কি যুগ-খলীফা ও এ জামা'তের জন্য নিয়মিত দোয়া করেছি?

প্রকাশনায়: আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

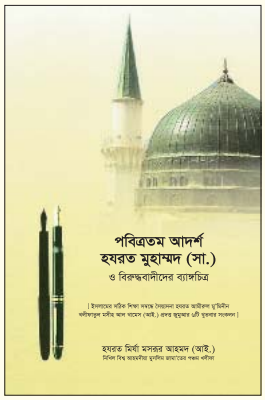

আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ রীতি অনুযায়ী আলো এবং সত্য সর্বদা জয়যুক্ত হয়ে থাকে। যারা অহংকারী এবং দাম্ভিক লোক তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলদের বিরোধীতা করে ঠিকই কিন্তু পরিণতিতে খোদার ক্রোধভাজন হয়। একইভাবে আজও কতক মানুষ এমন রয়েছে যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধীতায় মত্ত আছে। তাদের পরিণতিও আল্লাহ্‌র সুন্নত অনুযায়ী লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনই কতক মানুষ বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ২০০৬ সালে মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র মূলক কিছু কার্টুন আঁকে তাদের পত্র-পত্রিকায়।

২০০৬ সালের ঐ ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মীর্যা মসরূর আহমদ (আই.) একাধারে ৫টি খুতবা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর শান তথা মর্যাদার উপর প্রদান করেন। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০, ১৭, ২৪ এবং মার্চ মাসের ০৩ ও ১০ তারিখে উক্ত খুতবাগুলি প্রদান করেন। বইটিকে সমৃদ্ধ করার মানসে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর আরো ১টি খুতবা সংযোজন করা হলো।

উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

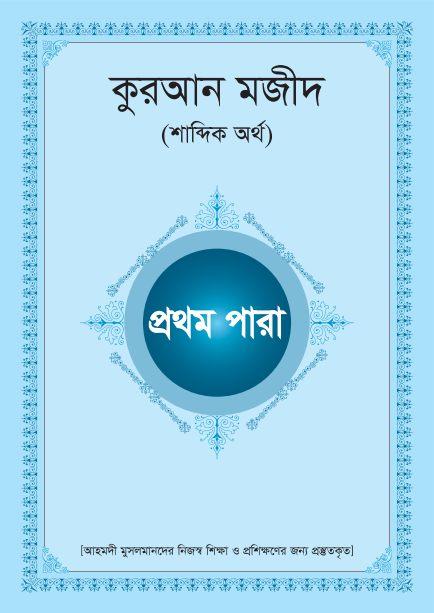

বর্তমান যুগে আমাদের নিকট কুরআন কেবল বাহ্যিকভাবে মূল্যবানরূপে পরিগনিত হচ্ছে। অধিকাংশই কুরআনের ভিতরে লুক্কায়িত মণি-মুক্তা আহরণের চেষ্টাই করে না। এ কারণে কুরআন মজীদের অর্থ পরিপূর্ণভাবে বুঝার স্বার্থে এই প্রথম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অনুবাদ আপনাদের সামানে উপস্থাপন করা হল। আশা করি জামা'তের সকলেই এ থেকে উপকৃত হবেন।

এটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

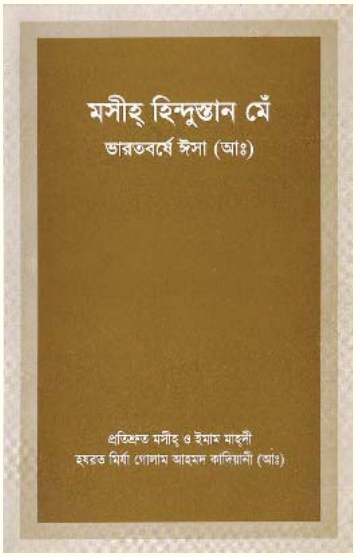

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৯ সালে প্রণয়ন করেন।

এখানে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে আগমন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এটি অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি পুস্তক।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 79 | 17-18th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st March, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

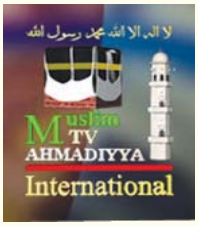

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com